খুদকুঁড়ো
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

খুদকুঁড়ো

বই পড়ুন... বই পড়ান...

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আত্মজা

‘রা-স্বা’

বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রী রঞ্জন সরকার

করকমলেষু

সূচীপত্র

লাহিড়িকাকু

বেণুদা

প্রিয় পপি

তারা ছিল বর-বউ

শিবেশ্বর মহাপাত্র

অজু

ধ্রুবদা

গোবিন্দর গল্প

জগুদা

খোকাকাকু টি টি

মনোহরপুকুরের সেই বাড়ি

সতীশবাবু

প্রাণটুক লইয়া আছি রে বাবা

এক অসহনীয় সৎ মানুষ

সাংঘাতিক সাইকেলবাজ

বাহান্ন দিন টানা শিয়রে

খালি হাতে বাঘ মেরেছিলেন

এ তো আচিমিৎকার জিনিস!

আনন্দই ছিল তাঁর ঈশ্বর

‘বুঝলা, হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেতাজি’

গোলাপ হাতে পড়াতে এলেন

তাঁর বিষাদ লোককে টানত

পশ্চাদ্দেশে দিল এক কামড়

সবাই 007 নয়, কেউ 000

টুপটুপাটুম মানে কী

আমার বমা, তোদের কী!

আমি কি মনিষ্যির মতো মনিষ্যি

টাকের ওপর সটান খাড়া শরীর

পায়ে আশি টাকার জুতো!

অঙ্ক ক্লাসের চার্লি চ্যাপলিন

পাগল মা-ই যেন তার মেয়ে

‘কবীন্দ্র রবীন্দ্র... বুঝলেন কিনা’

শনিবারে কালো কুকুরকে লুচি

সৎ, গরিব, ব্রাহ্মণ : হাঁড়িতে মা ভবানী

মিষ্টি বলতে মুড়ি + চিনি

লাহিড়িকাকু

আমার নিজের কোনও কাকা ছিল না বটে, কিন্তু আমার রেলতুতো কাকু অগুনতি। বদলে হয়ে হয়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য নানা জায়গায় চলে যেতাম এবং নতুন নতুন কাকু জুটে যেত। লাহিড়িকাকু যেমন। রোগা, বেঁটে, ক্ষয়াটে, ফোকলা একজন মানুষ। প্রথম পক্ষের ছেলে আর দ্বিতীয় পক্ষের বউ নিয়ে তাঁর সংসার। ছিলেন রেলের গার্ড। এমনিতে মানুষ কিছু খারাপ নন, কিন্তু সন্ধের পর প্রায় চুরচুর মাতাল হয়ে কোয়ার্টারে ফিরতেন। খুব হাল্লাচিল্লা মাচাতেন,পাতের ভাত তরকারি মাছ বাতাসে ওড়ানোর চেষ্টা করতেন। রোগা মানুষটা ওই সময়ে বীর হয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন। এ গল্প লাহিড়িকাকুর নয় আসলে। লাহিড়ি-কাকিমার। ভারী রোগাভোগা, বড্ড ভালোমানুষ আর বোকাসোকা এই কাকিমাটি তাঁর সতিনের ছেলেটাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতেন, আর বাবলুও তার এই মায়ের অন্ধ ভক্ত ছিল। কাকিমার সঙ্গে কাকুর কখনও ঝগড়া, মতান্তর, মনান্তর ছিল না। আমার বিশ্বাস, কাকিমা জানতেনই না ঝগড়া কী করে করতে হয়।

আমার নিজের মাকে আমি কখনও খুব একটা রেগে যেতে দেখিনি। রাগ করার খুব কারণ ঘটলে মা বকাঝকা করত বটে, কিন্তু চেঁচামেচি কক্ষনও নয়। আর লাহিড়ি-কাকিমার ওই বকাঝকাটুকুও ছিল না। সংসার এমনিতেই সচ্ছল নয়, তার ওপর কাকুর মদের নেশায় বিস্তর খরচ হত বলে প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যেই কাকিমা সংসার চালাতেন। কিন্তু কক্ষনও কাকুর সম্পর্কে কোনও নিন্দাবাক্য উচ্চারণও করতেন না। আমরা ঘরে গিয়ে দেখেছি, কত সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে কী সুন্দর গুছিয়ে সংসার করতেন কাকিমা। মুখে বিরক্তি নেই, ভ্রুকুটি নেই। বরং কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে থাকতেন।

পাউরুটি বাসি হলে টুকরোগুলো উনুনের বাইরের দিকে লাগিয়ে রেখে দিতেন। অনেক ক্ষণ মৃদু আঁচে গরম হয়ে হয়ে তা মুচমুচে টোস্ট বিস্কুট হয়ে উঠত। আমাদের বাড়িতে কত বার নিয়ে এসেছেন ওই সুস্বাদু টোস্ট বিস্কুট। কী যে ভাল লাগত খেতে।

কোনও ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞান জানা ছিল না তাঁর। পয়সার হিসেব করা ছাড়া অংকের পারদর্শিতা ছিল না। গুণহীনা, অবিদুষী এই মহিলা তবু কী অনায়াসে মাতাল স্বামী আর সতিনপো কে নিয়ে একটা ভারী শ্রীমণ্ডিত, শান্ত, পরিচ্ছন্ন সংসারকল্প চালিয়ে নিতেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, জ্ঞানী মানে কি সবজান্তা? যার যেটুকু জানলে চলে তার বেশি জানা কি খুব দরকার?

দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের কাছে আসতেন। বাইরে কটকটে রোদ, তবু এসেই বলতেন, ওই দেখেন দিদি, বৃষ্টি আসতেছে! মা অবাক হয়ে বলত, কোথায়! বাইরে তো রোদ! কাকিমা কিছু বলতেন না। তাঁর তো কিছুই কারও কাছে প্রমাণ করার ছিল না। তবে বোধহয় ঝড়বৃষ্টির প্রতি অমূলক একটা ভয় ছিল।

একদিন মা আমাদের বলল, ওরে, আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি দুধ দিয়ে রেণুর মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি। শুনে তো আমরা হেসে বাঁচি না। আমি বললাম, মা, দুধ দিয়ে কাকিমার মুখ ধোয়ালে কিন্তু কাকিমা আর এ বাড়ির ছায়াও মাড়াবে না। দুধ দিয়ে মুখ ধোয়া মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। মা মুখ চুন করে বলল, তা তো বুঝলুম বাবা, কিন্তু ভাবছি স্বপ্ন যখন দেখলুম তখন না ধোয়ালে যদি অমঙ্গল হয়? লাহিড়ি-কাকিমা, অর্থাৎ আমার মায়ের রেণু,কিন্তু স্বপ্নের কথা শুনে খুব খুশি। একেবারে ডগোমগো। কেউ যে তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে এতেই কাকিমা কৃতার্থ। এবং শেষ পর্যন্ত দুধ দিয়ে মুখ ধোয়ানোর পর্বটিও ঘটেছিল। এবং কাকিমা হাসিমুখেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন।

বেশি কথা কখনও তাঁকে বলতে শুনিনি। বড় জোর কী রাঁধলেন, কী ভাবে রাঁধলেন বা কী মাছ এসেছিল এইসব। সেই সব কথা এতই সামান্য যে আমাদের জাতীয় প্রগতিতে তার কোনও ভূমিকা নেই। তুচ্ছ কথা। তুচ্ছ জীবন, কোনও মহত্ত্ব নেই, সৃজন নেই, শিল্পও নেই।

তবু কিছু একটা আছে। না থাকলে এত দিন ধরে এই কাকিমাকে আমার মনে থাকতো না। হয়তো বাড়াবাড়িই হবে, তবু বলি আমার এই রেলতুতো কাকিমা যেটুকু জানতেন সেটুকুর সামনেই অনেক মহাজ্ঞানীকেও নতজানু হয়ে বসতে হবে। এঁর কাছে যেন আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল।

কাকুটি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার পিতৃদেব তাঁর বস। কাকু মায়ের সঙ্গেই বসে গল্প করতেন। তিনি জানতেন, মাতাল বলেই তাঁকে সবাই একটু নিচু নজরে দেখে। এ বাবদে তাঁর একটু আত্মগ্লানিও ছিল। লাহিড়ি-কাকিমার ওপর তাঁর অত্যাচার মা পছন্দ করত না। সে জন্য মাঝে মাঝে মা কাকুকে মৃদু বকাঝকাও করেছে। কাকু তখন তটস্থ হয়ে বলতেন, ওর কথা ছেড়ে দিন। ও তো পান্তাভাত। শুনে আমার কাকুর ওপর রাগ হতো। মানুষ আসলে কী চায়, তা সে বেশিরভাগ সময়েই বুঝে উঠতে পারে না। একই নারীর মধ্যে প্রেমিকা, সেবিকা, মোহিনী, বশংবদ,যৌনতাপ্রবণ ও নিস্পৃহ খুঁজলে তো হবে না। পুরুষের অবুঝপনা বোধহয় কোনও দিনই ঘোচার নয়। কাকিমার নিন্দেমন্দ করলে আমার মা কাকুর ওপর অসন্তুষ্ট হত এবং রেণুর পক্ষ নিয়ে বকাঝকাও করত। তখন মুখ চুন করে চলে যেতেন কাকু।

‘This is the way the world ends/ Not with a bang but a whimper’ – ঠিক এভাবেই পৃথিবীর নিরীহ, মুখচোরা মানুষেরা চলে যায়। ঠিক এভাবেই লাহিড়ি-কাকিমাও চলে গেলেন। যেন চুপটি করে পিছনের

দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো। মরাটা যেন ঠিক মরার মতো হল না। রাতে ঘুমোতে গেলেন। সকালে আর উঠলেন না। ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হল না, অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগল না, হাসপাতালে নিতে হল না, কাউকে বিড়ম্বনা পোহাতে হল না।

কাকিমা মারা যাওয়ার দিন তিনেক বাদে নাবালক পুত্রটিকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন কাকু। চোখ জবাফুলের মতো লাল। বাক্যহারা। কান্নায়, হেঁচকিতে, দিশাহারা চাউনিতে যেন দু'দিনেই আমূল বদলে গেছে লোকটা। রেণু নেই – এই কথাটা যেন কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত গভীর শোক আমি আর কারও কখনও দেখিনি।

সেদিন মনে হয়েছিল, কাকিমার বেঁচে থাকাটা যত তুচ্ছ ভেবেছিলাম, তত তুচ্ছ তো ছিল না।

বেণুদা

বেণুদার সঙ্গে ঘনাদার তফাত ছিল এইটুকুই যে, ঘনাদার গল্পে বিস্তর সত্যিকারের তথ্য থাকে, মজাও থাকে। বেণুদার তা নয়। আমার বেশ দূর সম্পর্কের দাদা। বয়সে অন্তত আমার চেয়ে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বড়। ব্যাচেলর ছিলেন বলে বেশির ভাগ আয়ুষ্কালই নানা মেস আর বোর্ডিং হাউসে কাটিয়েছেন। তবে আত্মীয়বৎসল ছিলেন খুব। দেওয়া-থোওয়ারও হাত ছিল। এল আই সি-তে কেরানির চাকরি করতেন। দায়-দায়িত্ব ছিল না তেমন। সুতরাং বেশ সচ্ছল। লোক খারাপ নন, কিন্তু ওই একটু ঘনাটে গোলমাল।

সন্ধেবেলা একদিন আমার মধ্যে কলকাতার বোর্ডিং এঁর ঘরে এসে বললেন, 'কাইল একটা কাণ্ড হইল, বুঝলি? কাইল পাহাড়ীমামার বাড়িতে গেছিলাম। আমারে পাইয়া পাহাড়ীমামার তো খুব আহ্লাদ। কইল কী জানস? কইল, আরে ভাইগ্না, আইজ না তোমার জন্মদিন? আসো, আইজ আমার বাড়িতেই তোমার জন্মদিন করি।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'পাহাড়ীমামাটা আবার কে?' 'আরে পাহাড়ীমামা হইল গিয়া পাহাড়ী সান্যাল। 'পাহাড়ী সান্যাল কোন সুবাদে বেণুদার মামা হলেন, তা আমার মাথায় আসছিল না। উনিই করুণাপরবশ হয়ে বললেন, 'বুঝলি না? পাহাড়ী সান্যাল হইল গিয়ে আমার মাইজ্যা জেঠিমার খুড়াতো ভাই। '

তখন এম এ পড়ি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে। এক ছুটির দিনে বেণুদা এসে হাজির। ওঁর খুব ইচ্ছে আমাকে একটা পাঞ্জাবি করে দেবেন। আমাকে নিয়ে চললেন দরজির দোকানে। যেতে যেতে বললেন, 'বুঝলি, গত রবিবার আমার মিছরিমাসির বাড়িতে ভ্যাকাদার লগে দেখা হইল। আমি কিন্তু কইলাম, ভ্যাকাদা তুমি কিন্তু কামট ভাল কর নাই। ভ্যাকাদা জিগাইল, কোনটা রে? আমি কইলাম,ওই যে স্টুডেন্টগো উপর পুলিশ অ্যাকশন লইছিলা। ভ্যাকাদা কিন্তু কইল, তুই ঠিকই কইছস। কাজটা ঠিক হয় নাই। ' আমার ফের এক গাল মাছি, 'ভ্যাকাদা লোকটা কে?' বেণুদা বুঝিয়ে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি। আর তিনি হলেন জনৈকা মিছরিমাসির ভাশুরপো।

একজন নতুন নায়িকা তখন সবে বাংলা চলচ্চিত্রে ঢেউ তুলেছেন এবং আমরা, বয়ঃসন্ধি পেরনো সদ্য যুবারা তখন তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি। ধরা যাক তাঁর নাম ধরিত্রী। বেণুদা এক রবিবার দুপুরে আমার পিসিমার বাসায় গিয়ে হাজির। সেখানে আমিও আছি। বেণুদা অম্লানবদনে বলে যাচ্ছিলেন, 'এই তো পরশু

ধরিত্রীর লগে টালিগঞ্জে ভানুর বাড়িতে দ্যাখা। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম কইরা কইল, বেণুদা, আমি কিন্তু সেই ধরিত্রীই আছি। আপনে তো আমারে সেই ছোটবেলা থিক্যাই দেইখা আইতেছেন। ' আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ভানু কে?' 'ক্যান? ভানু ব্যানার্জি! আরে হ্যায় হইল গিয়া আমার...'

ঘনাদা যা বলতেন, জেনেশুনেই বলতেন। পিছনে একটা মজা করার মোটিভ থাকত। বেণুদার তো তা নয়। 'গুলবাজ' বলে তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করায় আমার সায় নেই। আমার মনে হত, তিনি ওই ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট আইডেনটিটি খুঁজছেন। 'আমি তুচ্ছ বা সামান্য নই', এ তো সব মানুষই জানান দিতে চায় এবং তার নানা প্রকরণও সে অবলম্বন করে, সুতরাং বেণুদাকে নিয়ে আমি হাসাহাসি করতাম না অন্যদের মতো, বরং আমার একটু কষ্টই হত।

বেণুদা রিটায়ার করেছিলেন বোধহয় সত্তর সালের কাছাকাছি। সেই সময় একটা ভদ্রগোছের চাকরি করার পর প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি মিলে ষাট-সত্তর হাজার টাকা পাওয়া যেত। সত্তর সালে ষাট-সৎত্র হাজার টাকা ছিল অতীব লোভনীয় এক অঙ্ক। ফলে বেণুদার সঙ্গে জুটে গেল এক জন ধুরন্ধর দালাল।

এ কথা বিশ্বজনীন ভাবে স্বীকৃত না হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুনিয়ার সব ব্যাচেলরেরই বাস্তববোধ ও বুদ্ধির অভাব ঘটে। বিশেষ করে আগুয়ান বয়সে। আজ অবধি আমি একজনও স্বাভাবিক বাস্তববুদ্ধির ব্যাচেলর দেখিনি। দুলাল নামক সেই দালালটি বেণুদাকে মানিকতলার কাছে একটা চারতলা বিশাল বাড়ি দেখিয়ে বলেছিল যে ওই বাড়িটা তার। তবে শাশুড়ি মারা গেলেই বাড়িটা পুরোপুরি তার হবে। শাশুড়ি ক্যানসারে ভুগছেন। আর দু-চার মাস মাত্র। তারপরই বাড়ির মালিক হয়ে সে দোতলাটা বেণুদাকে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। বেণুদা সে কথা গভীর ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন।

বেণুদা রিটায়ার করার কয়েক মাস আগে থেকেই দুলাল তাঁকে ফরেন গুড্‌স-এর ব্যবসায় নামাল। জাপানি ঘড়ি, কলম, রাশিয়ান মুভি ক্যামেরা, রেডিওগ্রাম ইত্যাদি। জিনিসগুলি যে দু'নম্বরি এবং সম্ভবত চোরাই মাল, আর দুলাল যে একজন জোচ্চোর, তা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম জলের মতো। শুধু বেণুদা নয়। দুলাল তাঁকে বুঝিয়েছিল, যারা আমাকে জোচ্চোর, ঠগবাজ বলছে, ক'দিন পর আপনি নিজের গাড়িতে চেপে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসবেন আমি জোচ্চোর না সাচ্চা লোক।

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার একটা দুর্দম ইচ্ছে বেণুদার সেই প্রবীণ বয়সে কেন হয়েছিল কে জানে! কিন্তু ইচ্ছে এমনই বলবতী, কাণ্ডজ্ঞান আদপেই কাজ করছিল না। আমাকে কতগুলো সিকো ঘড়ি এনে দেখিয়েছিলেন। সেগুলো যে আসল সিকো নয়, তা বাচ্চা ছেলেরও বুঝবার কথা।

রিটায়ার করার পর ছ'মাসের মধ্যে দুলাল এবং বেণুদার প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রায় সমুদয় টাকা উধাও হয়ে গেল। এমনই দুরবস্থা, বেণুদার বাসভাড়া দেওয়ারও পয়সা ছিল না। এক রবিবার তিনি শ্যামবাজার থেকে

হেঁটে আমার যাদবপুরের বাসায় এসেছিলেন দেখা করতে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, আমার বউ তাঁকে যত্ন করে ভাত বেড়ে খাওয়ালো। সিক্ত চোখে তিনি বললেন, আজকাল তাঁর মুড়ি খাওয়ারও পয়সা থাকে না। তখন আমারও আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। ঠিক মনে নেই, হয়তো দশ-বিশ টাকা তাঁকে সঙ্কোচের সঙ্গে দিয়েছিলাম। আমাকে বললেন, 'দুই-চাইরটা জিনিস অখনও আছে। তুই আমার মুভি ক্যামেরাটা নে। ' আমি বললাম, 'আমি ছাপোষা মানুষ। মুভি আমার কোন কাজে লাগবে?'

রিটায়ার করার বোধহয় এক বছরের মধ্যেই প্রায় বিনা চিকিৎসায় এক আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। একজন বাস্তববুদ্ধিবর্জিত লোক ছিলেন বেণুদা। গুল মারতেন বটে, কিন্তু কারও কোনও ক্ষতি করেননি। কেউ বিশ্বাস না করলেও তাঁর কিছু যেত-আসত না। কিন্তু দুলাল তো তা নয়। দুলালের মতো মোটিভেটেড গুলবাজরা অনেক বেশি বিপজ্জনক। দুঃখের বিষয়, বেণুদা সর্বস্বান্ত হলেন একজন গুলবাজের কাছেই।

প্রিয় পপি

পপি যখন আমাদের বাড়িতে এল তখন তার বয়স তিন-চার মাস। আমার বয়স চোদ্দো বা পনেরো বছর। তখন আমরা আলিপুরদুয়ার জংশনে। রেল-শহরের শেষ প্রান্তে আমাদের বাংলো। তার পর ধু ধু সবুজ মাঠ আর ও-প্রান্তে দফাপুরের জঙ্গল।

বরাবর আমার কুকুর পোষার শখ। একেবারে গুড়গুড়ি বয়স থেকেই কুকুরছানা ঘেঁটে বড় হয়েছি। ময়মনসিংহের বাড়ি থেকেই দেখে আসছি, কুকুর, বেড়াল, কাক, বেজি, শালিখ, গরু, ঘোড়া আর হাতি আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত। মনে রাখতে হবে, তখন ঘোড়ার গাড়িই ছিল সবেধন যানবাহন। হাতিতে সওয়ার হতে হত প্রায়ই।

বাবার বদলির চাকরি বলে আমাদের এক পরিযায়ী জীবন ছিল ছেলেবেলায়। সে বড় যন্ত্রণার জীবন। এক জায়গায় সবে থিতু হয়েছি, নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছে, অমনি বদলির হুকুম এল আর আমাদের 'চলো মুসাফির, বাঁধো গাঁঠোরি' অবস্থা। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হত বন্ধুবান্ধব আর পোষা কুকুরদের ছেড়ে আসতে। সে সব অবশ্য নেড়ি কুকুর। তবু ভালবাসা তো ছিল। মায়ের কাছে কত বায়না করতাম, 'ভুলুটাকেও নিয়ে যাই না মা।' মা রাজি হত না। বলত, 'গাড়িতে হেগেমুতে ছিষ্টি করবে বাবা। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন করে কুকুর পুষিস'। আর সেটাই হত। কিন্তু পুষে কী লাভ! দু'দিন পর ফের স্থানত্যাগ এবং পোষ্যকে ছেড়ে আমার কষ্ট।

পপি দিশি নয়। আবার খুব বেশি বিদেশিও নয়। দেওয়ানজি নামে এক রেলকাকু ছিলেন। তাঁরই পোষা ভুটিয়া কুকুরের বাচ্চা। আমার কুকুরের খুব শখ দেখে একটা ছানা উপহার দিয়েছিলেন। ছোট্ট, রোমশ, তুলতুলে, ভারী সুন্দর। গায়ের রংটা ছিল ভুশকো মতো। অনেকটা শেয়ালের রং। তাকে মুহূর্তের মধ্যে ভালবেসে ফেললাম। সেও আমাকে। কোলে নিয়ে আদর করতাম, চান করাতাম, খাওয়াতাম। সেই ছানা বয়সেই সে আমার আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। আমি যেখানে, সেও সেখানে। ঝুড়িতে বস্তা পেতে তার শোওয়ার জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসে চুপটি করে শুয়ে থাকত আমার খাটের নীচটিতে।

বাবার বদলির ধাক্কায় আমার পড়াশোনা শিকেয় ওঠার জোগাড়। তাই মা আর বাবা মিলে পরামর্শ করে আমাকে হোস্টেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করলেন। সেই মতো কাছাকাছি কুচবিহারে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে

আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হল। পপির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির সেই শুরু। তবে, সপ্তাহান্তে শনিবার বিকেলে চলে আসতাম, সোমবার সকালের গাড়ি ধরে ফিরে যেতাম।

শনিবার যখন বিকেলে বাড়ি আসতাম, তখন পপির আহ্লাদ ছিল দেখার মতো। ছুটে এসে সে প্রথম আমার পায়ের ওপর পড়ে গড়াগড়ি খেত। তার পর 'ভুক ভুক' করে লাফিয়ে লাফিয়ে আমার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে কত যে অবোধ ভাব প্রকাশ করত, তা বলার নয়। ওই মিনিট পাঁচেক সে আমাকে পুরোপুরি দখল করে থাকত। কিন্তু ভারী সভ্য কুকুর ছিল সে। আবেগের প্রকাশ সাঙ্গ হলে সে আর বিরক্ত করত না। শান্ত হয়ে নিজের জায়গায় চলে যেত।

পপি আকারে খুব একটা বড়সড় ছিল না। বরং একটু ছোটর দিকেই। আর তার স্বভাবটি ছিল শিষ্ট ভদ্রলোকের মতো। কখনও রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে যেত না। আমরা কখনও তাকে অকারণে ঘেউ ঘেউ করতে শুনিনি। একটুআধটু যে ডাক ছাড়ত, তাও ছিল মিষ্টি ও মোলায়েম। তা বলে তাকে ভিতু মনে করলে ভুল হবে। সে নির্ভয়ে রাস্তায় বেরোত। অন্য কুকুররা তেড়ে এলেও পালাত না। মুখোমুখি হত। কিন্তু মারামারি করতে দেখিনি কখনও। তার শিষ্টতা ও সৌজন্যেরও বোধহয় একটা জোর ছিল। অন্য কুকুরেরা তার সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখত না।

আমি কুচবিহারে পড়ে রইলাম। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা বদলি হয়ে চলে গেলেন কাছাড়ের বদরপুর। এ বার কী হল কে জানে, মা-বাবা পপিকে ফেলে গেলেন না। সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমার কী আনন্দ! পুজোর ছুটিতে যখন বদরপুর যাচ্ছি, তখন বাড়ি গিয়ে মা-বাবা, ভাই-বোন, বা দিদির সঙ্গে দেখা হবে বলে যেমন আনন্দ, তেমনই পপির সঙ্গে দেখা হবে বলেও আনন্দ হচ্ছিল।

পপির অভ্যর্থনা সেই একই রকম। প্রথমে পায়ের ওপর গড়াগড়ি, তার পর হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে কিছু ক্ষণ আদর। তার পর আর একটুও বিরক্ত করত না আমাকে। তবে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইত। আমি বারণ করলে লক্ষ্মীছেলের মতো নিরস্ত হত। মা বলত, 'তুই চলে গেলে পপি তিন-চার দিন খুব মনমরা হয়ে থাকে।'

আরও কয়েক জায়গা ঘুরে বাবা বদলি হয়ে শিলিগুড়িতে যখন, বাবাকে কেউ একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর উপহার দেয়। তার নাম ছিল রেনি। মাদি কুকুর। প্রচণ্ড রাগী, জঙ্গি। বাড়ির বাগানে গরু-ছাগল ঢুকলে তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিত। শিকলে না বেঁধে উপায় ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, রেনির সঙ্গে পপির কখনও কোনও বিবাদ বিসংবাদ ছিল না। আমি রেনিকে একটু-আধটু আদর করলে অবশ্য পপি কাছে এসে ঘুরঘুর করত।

রেনি বেশি দিন বাঁচেনি। আমাদের বাড়িতে বছর দুই থাকার পর সে মারা যায়। কিছু দিন পরে আরও একটি অ্যালসেশিয়ান কেউ উপহার দেয়। তার নাম রাখা হয় ডিউক। ডিউক মদ্দা কুকুর এবং যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কারও সঙ্গেই সহাবস্থানে পপির কোনও অসুবিধে হয়নি। ডিউক বড়সড় রাগী কুকুর। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত-আগন্তুক-ভিখিরি-কুকুর-বেড়াল-কাক-পক্ষী এলেই চেঁচামেচি করত। বেঁধে না রাখলে হয়তো কামড়েও দিত। অবশ্য আমরা ধমক দিলে আত্মসংবরণও করে নিত। কিন্তু পপি ছিল বিচক্ষণ। কে এলে জানান দিতে হবে এবং কে এলে কোনও বিপদ নেই, এটা সে নিজের বুদ্ধি দিয়েই বুঝে নিত। ভিখিরিদের তাড়াত না। অতিথি-অভ্যাগত এলে একটু মেপে নিত এবং লক্ষ করত বাড়ির লোক তাকে কেমন ভাবে নিচ্ছে। ভদ্রলোক আর কাকে বলে!

পপির কোনও বায়নাক্কা ছিল না। এঁটোকাঁটা খেয়েই সে দিব্যি ছিল। বাইরে গিয়ে কখনও অখাদ্যকুখাদ্য খেয়ে আসত না। কখনও ঠাকুরঘর বা রান্নাঘরে ঢুকত না। রেল-বাংলো ছেড়ে কিছু দিন আমরা এক ভাড়াবাড়িতে ছিলাম। সেখানে শৌচালয়টি ছিল একটু দূরে। আমার এক বৃদ্ধা ঠাকুমা যখনই শৌচালয় যেতেন, পপি সতর্ক অভিভাবকের মতো তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসত।

তখন আমি কলকাতায়। লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত। মায়ের লেখা একটা পোস্টকার্ডে পপির মৃত্যুসংবাদ এল। বুকের ভিতরটা ধু ধু করে উঠেছিল। বন্ধুবিয়োগ তো বটেই, আজও মনে হয় পৃথিবী থেকে এক জন সত্যিকারের ভদ্রলোক চলে গিয়েছিল সে দিন। আমি আর কোনও কুকুর পুষিনি।

তারা ছিল বর-বউ

তারা ছিল বর-বউ। কিন্তু তারা যে বর-বউ, এটা তারা নিজেরাই জানত না। রাখালের বয়স সাত-আট আর পুতুলের চার-পাঁচ।

আমাদের মস্ত উঠোনে প্রায় রোজই সাত-আট জন বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলতে আসত। ছোটাছুটি, ছোঁয়াছুঁয়ি, চোর-চোর, এক্কা-দোক্কা বা যা হোক কিছু। দাদু কাছারিতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা আসত। কারণ দাদু ছিলেন রাশভারী মানুষ, হই-হট্টগোল পছন্দ করতেন না।

ময়মনসিংহে তখন মাঠঘাটের অভাব ছিল না। তবু বাচ্চারা যে আমাদের উঠোনে বা বারবাড়িতে খেলতে আসত তার একটা কারণ ছিল। ঠাকুমা প্রায় রোজই বাচ্চাদের ডেকে বাতাসা বা মুড়ির মোয়া, নাড়ু, ফলের টুকরো, কিংবা কাঁঠালপাতায় চাল-কলামাখা ছোট দলা দিতেন। ওই বয়সে তখন ওই সব খাবার ছিল যেন অমৃত।

আমাদের বাড়ির পিছন দিকে, পগার পাড়ে পাশাপাশি দুটি দীনহীন ঘরে দুটি পরিবার থাকত। পুতুলের বাবা ভটচায বামুন, আর রাখালরা বাঁড়ুজ্যে। দুটি পরিবারে খুব ভাবসাব। পালে-পার্বণে, দোল- দুর্গোৎসবে তারা আমাদের বাড়ি আসত। কত কাজ করে দিয়ে যেত।

রাখালের হিরো ছিল সাইকেল মিস্তিরি মিজানুর। বড় রাস্তায় ললিতের মুদিখানার পাশেই তার সাইকেল সারাইয়ের চালাঘর। রাখাল ফাঁক পেলেই সেইখানে গিয়ে মন দিয়ে টিউবের লিক সারানো থেকে শুরু করে সব কিছু দেখত। জিজ্ঞেস করলেই বলত, বড় হয়ে সে সাইকেলের মিস্তিরি হবে। একটা ভারী ছোটখাটো স্কুলে সে পড়ত। বইখাতা জুটত না বলে এর-ওর-তার বাড়িতে গিয়ে পড়ে আসত।

পুতুল দেখতেও যেন পুতুল। টুলটুলে মুখ, ফরসা রং, কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ ছিল আর অবাক চাউনি।

রাখাল আর পুতুল যে বর-বউ, তা আমরা জানতাম না। ওরাও জানত না। দঙ্গলের মধ্যে দুজনেই খেলতে আসত আমাদের উঠোনে।

ফিসফাস একটু ছিলই। জানাজানি হতে আরও একটু সময় লেগেছিল। তবে খবর ছড়িয়ে পড়াতে খুব একটা হইচই পড়ে যায়নি। ছিছিক্কারও নয়।

রাখালকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, হ্যাঁ রে, পুতুল কি তোর বউ? রাখাল ঠোঁট উলটে বলত, দূর, ও তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে! পুতুলকে জিজ্ঞেস করলে পুতুল একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকত, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারত না। কিন্তু বুঝুক না বুঝুক, পুতুল রাখালের ফাইফরমাশ খাটত সারা দিন। আর যেখানে রাখাল সেখানেই পুতুল। রাখাল মাছ ধরছে তো পাশে খালুই নিয়ে বসে আছে পুতুল। রাখাল নারকোল পাড়তে গাছে উঠেছে তো নীচে নারকোল কুড়োতে পুতুল মোতায়েন। রাখাল ঘুড়ি বানাতে বসল তো আঠার ভাঁড় নিয়ে সেখানে পুতুল মজুত। রাখালের জ্বর হল তো শিয়রে বসে পুতুল। ওই বয়সেও কিছু না বুঝেও কি কিছু বুঝতে পারত পুতুল? নইলে ওই আনুগত্য কেন?

এ দুটি ছোট্ট বর-বউকে নিয়ে পাড়ায় ঠাট্টা-মশকরাই হত। আবার অনেকে মুগ্ধ হয়ে দেখত।

কী হত কে জানে? লায়লা-মজনু, রোমিয়ো-জুলিয়েট কত প্রেমের গল্পই তো আমরা জানি। কিন্তু আড়ে আড়ে ঝড়-তুফান থাকে, বাধাবিপত্তি আসে।

এক দিন রাত পোহাতেই সেই মহাসংকট এসে দরজায় দাঁড়াল। অবিশ্বাস্য, বাক্রোধকারী সেই সংকট, পার্টিশন, দেশভাগ! কী যে তোলপাড় হুলস্থুল পড়ে গেল তা বলার নয়। তখন কে কাকে দেখে, কে কাকে সামলায়, কে কার খোঁজ রাখে! চার দিকে পালাই-পালাই রব।

কে কোথায় ছিটকে গেল কে জানে! আমাদের একান্নবর্তী এককাট্টা পরিবারটাই তো চার ভাগে ভাগ হয়ে চার জায়গায় ছত্রখান হয়ে পড়ল। সেই ডামাডোলে রাখাল বা পুতুলের কথা মনে থাকার ব্যাপারই তো নয়।

প্রায় পঁচিশ বছর পর বনগাঁয়ে একটা সভা করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। সভা থেকেই ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। ছোট পাকা বাড়ি। সেই আগের দারিদ্র নেই, আবার বড়লোকও হয়ে যাননি। দুই ছেলে চাকরি করে। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পুতুলের বিয়ে হয়নি। যখন দেশ ছেড়েছিলেন তাঁরা তখন পুতুলের বয়স ছিল আট-নয় বছর। এখন তেত্রিশ-চৌত্রিশ। রং তত ফরসা নেই আর, তবে মুখে লাবণ্যটুকু আছে। সেই বড় বড় চোখ, একটা স্কুলে পড়ায়।

কাকা, পুতুলের বিয়ে দেননি কেন?

কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, কী করে দিই? নিজে মন্ত্রপাঠ করে এক বার দিয়েছিলাম। ধর্মভ্রষ্ট হব না? তবু হয়তো চাপে পড়ে দিতাম। কিন্তু পুতুলই রাজি নয়। রাখালদের অনেক খোঁজ করেছি। পাইনি। এক জন বলল, ওরা কানপুরে চলে গেছে। কানপুর তো অনেক দূরের পাল্লা। কী করি বল তো?

কানপুরে গিয়ে খোঁজা সহজ ছিল না, তবে আমি নরেশ জ্যাঠার শরণাপন্ন হই। নরেশজ্যাঠা একমাত্র দেশের লোকের খোঁজখবর রাখতেন, শুনেই বললেন, রাখাল? আরে রাখাল না, অর আসল নাম মৃগাঙ্ক ব্যানার্জি, হ্যায় তো এখন তালেবর লোক, আইএএস অফিসার, দিল্লিতে পোস্টেড।

মৃগাঙ্কর নাগাল পাওয়া শক্ত হল না, একটু তৎপরতার পর ট্রাঙ্ক কল করে তাকে ধরলাম। প্রথমে ফোন ধরল তার সেক্রেটারি, তার পর রাখাল।

রুনুদা, আপনি?

কেমন আছিস?

ভাল আছি দাদা।

বিয়ে করেছিস?

হ্যাঁ তো, দুটো ছেলেও হয়েছে।

একটু ধানাই পানাই করার পর জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ রে, পুতুলকে তোর মনে আছে?

থাকবে না? কী যে বলেন! ক্যাম্পে ক্যাম্পে কত খুঁজেছি তাকে! তার পর বড়মামার কাছে কানপুরে চলে গেলাম, আর খোঁজ পেলাম না। আপনি কি তার কোনও খবর জানেন দাদা?

না রে। কে কোথায় ছিটকে গেছে।

যদি খবর পান আমাকে জানাবেন?

জানাব।

পৃথিবীর সব ঘটনাই যদি আমাদের মনের মতো করে শেষ হত, তা হলে জীবনটা ঠিক যাপনযোগ্য হত না। তাই পুতুলকে রাখালের বা রাখালকে পুতুলের খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই।

শিবেশ্বর মহাপাত্র

সেটা ১৯৫৮-৫৯ সাল হবে। সকাল ছ'টা-সাড়ে ছ'টার সময় একটা ঝোলায় পাঁউরুটি, কলা আর কাচের বোতলে জল নিয়ে সেজেগুজে রওনা হয়েছি ইডেনে। তখন থাকি উত্তর কলকাতার একটা সরু আর জটিল গলিতে, ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে। বাড়িটা এতই পুরনো আর ঝুরঝুরে যে কর্পোরেশন একাধিক বার বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে নোটিস দিয়েছে। কিন্তু হোস্টেলের ইনচার্জ শিবেশ্বর মহাপাত্র সেই সব নোটিসকে পাত্তা দেননি। হোস্টেলের একটা অংশে একতলা, দোতলা আর তিনতলা মিলিয়ে অন্তত পাঁচ-সাতখানা ঘর নিয়ে তাঁর বাস। অনেক ছেলেপুলে ছিল তাঁর। আর বাড়ি ছাড়তে হলে আমরা ছত্রিশ জন বোর্ডার কোথায় যাব, তাও ভাবনার বিষয়।

যা বলছিলাম, সকালে টেস্ট ম্যাচ দেখতে বেরোচ্ছি। শিবেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা। পরনে আধময়লা ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে সেই ধুতিরই খুঁট জড়ানো, খালি পা, এইটেই মার্কামারা পোশাক। ওই চেহারা আর পোশাকেই তিনি অলিগলি পেরিয়ে দোকান-বাজার করতেন। শুধু ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিতে যাওয়ার সময় পরনে বাড়িতে কাচা, ইস্তিরিহীন পাঞ্জাবি আর খাটো ধুতি এবং তত্‌সহ পায়ে একজোড়া চপ্পলও থাকত।

আমাকে দেখেই ধমকের সুরে বললেন, 'এত সকালে কোথায় যাচ্ছ? সঙ্গে ব্যাগ কেন?' হোস্টেলে সবে ভর্তি হয়েছি, শিবেশ্বরবাবুকে ঠিকমত মাপজোক করা হয়নি তখনও। তাই ভালমানুষের মতোই বললাম, 'টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছি স্যর, ইডেনে।' খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'কী ম্যাচ?' আমি বিনয়ের সঙ্গেই বললাম, 'স্যর, আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ইন্ডিয়ার ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ।'

ক্রিকেট খেলা যে কারও কাছে এত ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য ব্যাপার হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ যেন আগ্নেয়গিরির লাভা বেরিয়ে আসতে লাগল, 'কী? ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছ? অ্যাঁ! ক্রিকেট ম্যাচ! তোমাদের জেনারেশনটাই তো অধঃপাতে গেছে দেখছি! তোমাদের লজ্জা হয় না? নিজের কত বড় সর্বনাশ করছ, সেটা জানো? ভদ্রলোকের ছেলেরা, ভাল ছেলেরা ফুটবল-ক্রিকেট দেখতে যায়? ছি ছি, তোমাদের ছাত্র বলে পরিচয় দিতেই যে লজ্জা করে!'

এ রকম ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ায় ভারী থতমত খেয়ে গেছি। ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেট, ফুটবল খেলে বড় হয়েছি। আমার পিতৃদেব স্বয়ং খুবই ভাল ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলতেন। এই সব নির্দোষ খেলার মধ্যে কোন অধঃপতনের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, বুঝতে পারলাম না। উনি অবশ্য আমাকে তীব্র ভর্ত্‌সনা করেই

হনহন করে চলে গেলেন। আমিও যথারীতি মাঠে চলে গেলাম। পরে শুনেছি, উনি সিনেমা-থিয়েটারেরও ঘোর বিরোধী।

কিন্তু ওঁকে ভয় পাওয়ারও তেমন কারণ ছিল না। কারণ উনি খুব অন্যমনস্ক এবং দিশাহীন মানুষ। রোগা, শ্যামবর্ণ, টেকো, অতি সাধারণ চেহারায় ওই আধময়লা ধুতির খুঁট জড়ানো পোশাকে কেউ তাঁকে অধ্যাপক বা বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে বুঝতেই পারত না। কত বার ভিজিটর এসে তাঁকে সামনে পেয়ে দারোয়ান মনে করে জিজ্ঞেস করেছে, ‘এই যে দারোয়ানজি, অমুক কি হোস্টেলে আছে?’ এতে শিবেশ্বরবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত বা অসন্তুষ্ট হতেন না। ঠান্ডা গলাতেই বলতেন, ‘আছে বোধহয়, ভিতরে গিয়ে খোঁজ করুন।’

এক দিন ইলিশ মাছ রান্না হয়েছে। কিন্তু রান্নাটা মোটেই ভাল হয়নি। খুন্তির ওপর এক টুকরো মাছ চাপিয়ে নিয়ে আমরা দল বেঁধে শিবেশ্বরবাবুর বাড়িতে হানা দিলাম। ওঁর বাড়ির মহিলারা বাইরের লোকেদের সামনে বেরোতেন না। ছোট মেয়েটি পাছে কারও নজরে পড়ে, সেই ভয়ে স্কুলে অবধি দেননি। সেই মেয়েটি পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু গলির দৃশ্য দেখত। আমরা কড়া নাড়তেই সেই মেয়েটি এসে দরজা খুলেই আমাদের দেখে হরিণ-পায়ে ভিতরে পালিয়ে গেল। মস্ত ঘোমটায় আবক্ষ ঢেকে স্যারের গৃহিণী এসে নীরবে আমাদের নালিশ শুনলেন। জবাবে ক্ষীণকণ্ঠে কী বললেন, বোঝাই গেল না। ঘণ্টাখানেক বাদে ব্যস্তসমস্ত শিবেশ্বর এসে সব মাছ ওঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বললেন। বিকল্প হিসেবে ছোট ছোট মাটির খুরিতে মিষ্টি দই, যার দাম এক বা দু’আনা হবে বড়জোর।

একটু কিপটে ছিলেন, বায়ুগ্রস্তও। কিন্তু সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে ও রকম অসাধারণ পণ্ডিতও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না কেউ। ওই সব বিষয়ে যে কোনও প্রশ্ন করলেই জলের মতো বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

কিন্তু বাড়ির অবরোধে জোর করে মেয়েদের আটকে রাখলে তার ফল খুব ভাল হওয়ার নয়। শিবেশ্বরবাবুর বড় মেয়ে এক দিন তার পছন্দের একটি যুবকের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। থানাপুলিশ নিয়ে তুমুল অশান্তি করেছিলেন শিবেশ্বর। লাভ কিছু হয়নি। আবার কিছু দিনের মধ্যেই ঘটনাটি ভুলে একেবারে আগের মতো নির্বিকার হয়ে গেলেন। বুঝতে পারতাম, তিনি একটা যুগের চৌকাঠে থেমে আছেন। ওই চৌকাঠ কিছুতেই পেরোতে চাইছেন না। চারদিককার যে চলমান সমাজ ও সভ্যতা, মানুষের নানা আচার-আচরণের পরিবর্তন, এগুলো প্রাণপণে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছেন। আবার মজা হল, অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলেও তাঁর একটা তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হত বটে, কিন্তু আবার নির্বিকার হয়ে যেতে একটুও সময় লাগত না।

ওই যে আধময়লা ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে বেড়াতেন, এতে মর্যাদাহানি হচ্ছে, বুঝতেই পারতেন না। পাড়ায় কেউ কখনও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করত না। তিনি অবশ্য প্রত্যাশীও ছিলেন না। আমাদের ওই

এঁদো গলিতে একটা গ্যাসলাইট ছিল, প্রত্যেক সন্ধেতেই জ্বলত। তখনও কলকাতায় কিছু বিরল জায়গায় গ্যাসবাতি জ্বলত। পৌরাণিক ওই বাতিটার দিকে চাইলেই আমার মনে হত, এ যেন শিবেশ্বর মহাপাত্র, ওর দিন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝতে চাইছে না।

আমি সে বার এম এ পরীক্ষায় ড্রপ দেব শুনে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, মনে হল মেরেই বসবেন বুঝি। 'ড্রপ দেবে? ড্রপ দেবে? ইয়ার্কি নাকি? বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করছ! ছি ছি!'

পর দিন বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'স্যর আর এক বছর হোস্টেলে থাকতে দেবেন? আর কোথাও সিট পাচ্ছি না। '

এক বার তাকালেন মুখের দিকে, তার পর বললেন, 'তা হলে আর যাবেই বা কোথায়? থাকো। '

অজু

অজু আর আমি এক ক্লাসে পড়তাম। রোগা, সাদা, শিটকে চেহারা ছিল অজুর। হনুসর্বস্ব মুখ, কণ্ঠমণির ওঠানামা দেখতে পাওয়া যেত। হাত আর পায়ে চামড়ার নীচে নীল শিরা অবধি দেখা যেত। বারো মাস ম্যালেরিয়া আর আমাশায় ভুগত সে। স্কুলে কামাই হত আর ছুটির দরখাস্ত জমা পড়ত তার। ক্লাসটিচার বঙ্কিমবাবু বলতেন, এত কামাই করলে কি পরীক্ষায় পাশ হবি রে?

রতন নামে একটা গুন্ডা ছেলে ছিল ক্লাসে। সে ছিল যত দুবলা আর ভিতু ছেলের শত্রু। ফাঁক পেলেই কাউকে পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিত বা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চটাস করে মাথায় একটা চাঁটি মেরে চলে যেত নয়তো হঠাৎ মুখোমুখি এসে দুম করে বুকে বুক দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত। তার অত্যাচারে অনেকেরই হাঁটু ছড়ে গেছে, কনুই কেটেছে, কপালে কালশিটে পড়েছে। কিন্তু রতনের গায়ে ভীষণ জোর। কেউ আমরা তাকে কিছু বলার সাহস পেতাম না। বেচারা অজু প্রায়ই তার শিকার হত। আর আমার কাছে নালিশ করত, জানিস, রতন আজ আমার চুল টেনেছে। কিংবা, আজ রতন ইচ্ছে করে কনুই দিয়ে আমার পাঁজরে এমন গুঁতো মেরেছে যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি শুনতাম, কিন্তু কিছু করার সাধ্য ছিল না।

এক বার দিন দশেক জ্বরে ভুগে অজু স্কুলে এসে আমাকে বলল, জানিস, এ বার যখন খুব জ্বর হল, এক দিন দুপুরে একটা ঘুঘুপাখি আমাদের আমগাছটায় এসে বসেছিল। আমি ভাবলাম, পাখিটা যদি আমগাছ থেকে উড়ে পেয়ারাগাছটায় এসে বসে, তা হলে ঠিক আমার জ্বর সেরে যাবে।

আমি বললাম, বসল?

না রে। অনেক ক্ষণ ভগবানকে ডাকলাম, ঠাকুর পাখিটা এসে পেয়ারাগাছটায় একটু বসুক। কিন্তু বসল না। আমগাছ থেকে উড়ে শিমুলগাছে গিয়ে বসল। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল!

সে বার এক জ্যোতিষী এসেছিল ওদের বাড়িতে। অজুর মা ছেলেকে তার সামনে নিয়ে বললেন, বাবা, ছেলেটা আমার বড্ড ভোগে। ওর একটা ব্যবস্থা করে দিন। জ্যোতিষী হাত-টাত দেখে অনেক আঁক কষে বললেন, খারাপ সময় যাচ্ছে মা। একটা মাদুলি নিতে হবে।

কিন্তু মাদুলির দাম চোদ্দো টাকা শুনে মায়ের মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তখনকার চোদ্দো টাকা মানে অনেক, অনেক টাকা। আমাদের বয়সি ছেলেদের প্রায় কেউই তখন জুতো পরত না। কারণ এক জোড়া

জুতোর দাম আড়াই বা তিন টাকা। আমাদের স্কুলব্যাগ বলতে কিছুই ছিল না, ছাতা ছিল না। বইখাতা কাঁধে নিয়ে স্কুলে যেতাম। বৃষ্টি হলে বই বাঁচাতে জামার তলায় ঢাকা দিতাম। সেই আমলের চোদ্দো টাকা অজুরা কোথায় পাবে?

এক দিন অজু স্কুল থেকে ফেরার পথে দুঃখ করে গেল, জানিস, আমি আর বাঁচব না। কাল মা পাশের বাড়ির মিনতিমাসিকে বলছিল, আমার অজুটা যা ভুগছে, ও কি বাঁচবে দিদি?

আমাদের ভয়ের সময় ছিল স্কুলের টিফিন পিরিয়ড আর ছুটির পর। ওই সময়েই রতন আর তার সঙ্গে আরও কয়েকটা পাজি ছেলে হামলা করত। অজু ভয়ে আমার জামা খামচে ধরে পায়ের সঙ্গে লেগে থাকত তখন। যদিও আমি মোটেই বীর নই।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ট্রেন ভর্তি গোরা সেপাইরা যেন কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়। তাদের ভারী বুটে ঠনাঠন শব্দে আমাদের বুকের ভিতর গুড়গুড় করে। তারা অবশ্য আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে ভারী হিংসে করি। আমরা কেন যে ওদের মতো নই!

সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ চলছে। সারা দিন পালে পালে ভিখিরিরা ‘ফ্যান দাও, ভাত দাও’ বলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এখানে সেখানে দু’একটা করে কঙ্কালসার দেহ পড়ে থাকতেও দেখা যায়, যাদের ধাঙড়রা তুলে বাঁশে ঝুলিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যেত।

সেই সময়ে এক দিন রেলব্রিজের নিচে একটা দু’আনি কুড়িয়ে পেয়ে সে কী আনন্দ অজুর! আস্ত একটা দু’আনি, একটা দু’আনির ক্রয়ক্ষমতা তো কম নয়! বোধহয় কোনও সাহেব মিলিটারি ভিখিরির উদ্দেশে ছুড়ে দিয়েছিল, সেটাই গড়িয়ে এসেছে। আমাকে চুপি চুপি বলল, এটা বাবাকে দেব, আমাদের তো খুব অভাব!

বার্ষিক পরীক্ষার আগে অজুর হল টাইফয়েড। সে কী জ্বর! এক দিন দেখতে গিয়েছিলাম, ঘোর লাগা চোখে চেয়ে দেখল আমাকে, চিনতে পারল না। ওর মা মুখ চুন করে বলল, কী যে করি বাবা, জ্বরে জ্বরে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাহান্ন দিন ভুগে অজুর জ্বর সারল। এত রোগা হয়ে গেল যে জামাপ্যান্ট সব ঢলঢল করে। তখন তো কোমরে বেল্ট জুটত না আমাদের। মায়ের পুরনো শাড়ির পাড় দিয়ে কোমরে প্যান্ট এঁটে স্কুলে আসত অজু। আরও দুর্বল, আরও সাদা। বঙ্কিমবাবু বললেন, পাশ করবি কী করে বল তো? জুলজুল করে চেয়ে রইল শুধু। কী বলবে? জ্বরের সঙ্গে সে আর কত লড়াই করতে পারে?

আমি আর অজু স্কুল থেকে ফিরছি। হঠাৎ কোথা থেকে রতন উদয় হল। সে আমাদের আগে আগে রাস্তা জুড়ে এক বার বাঁ দিক এক বার ডান দিকে সরে হাঁটতে লাগল। ছুতোনাতায় ঝগড়া পাকিয়ে পেটানোর

মতলব। অজু ভয়ে আমার জামা খামচে ধরে ছিল। আমাকে বলল, ও অমন রাস্তা জুড়ে হাঁটছে কেন? রতন মুখ ফিরিয়ে বলল, বেশ করছি হাঁটছি, এটা কি তোর বাবার রাস্তা?

তখন ওই বয়সে আমাদের কাছে মা-বাবার চেয়ে প্রিয় মানুষ নেই। প্রত্যেকেরই মনে হত, আমার বাবা-ই সেরা বাবা, আমার মা-ই সেরা মা। তাই মা-বাপ তুলে কেউ কথা বললে বড্ড গায়ে লাগত। তবু সত্যি কথা কবুল করি, কথাটা রতন আমাকে বললে আমি হয়তো অপমানটা হজম করে নিতাম। মার খাওয়ার ভয়েই।

কিন্তু কোন কথা যে কার কোথায় গিয়ে লাগে! আচমকাই আমাকে ছেড়ে দিল অজু। একটা দুর্বোধ্য জান্তব শব্দ বেরলো তার মুখ দিয়ে, তার পরই পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সে পড়ল রতনের ওপর। অবিশ্বাস্য! রোগাপটকা, সাদা শিটকে চেহারার অজু যেন তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে রতনকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছিল। না, একতরফা নয়, রতন গুন্ডা ছেলে, ছাড়বে কেন? উলটে সেও মারছিল অজুকে। কিন্তু অজু তখন উন্মাদ। শুধু হাত-পা নয়, অজু তখন নিজেই যেন এক মারাত্মক অস্ত্র। এক সময়ে সে রতনকে রাস্তায় ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে একটা ইট তুলে বলল, আর বলবি? রতন প্রাণভয়ে বলল, না বলব না। ছেড়ে দে।

আমার দৃশ্যটা দেখে মনে হল, আরোগ্য! মনে হল, বিজয়। মনে হল একটা ছেলে নিজের ধ্বংসস্তূপ থেকে ফের ওই উঠে দাঁড়াল!

ধ্রুবদা

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।' কিন্তু আমি যার কথা বলছি, তিনি মাত্র ছ'বার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়েছিলেন। যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ সেই চল্লিশের দশকে, ম্যাট্রিকে এক বিষয়ে ফেল হলেই ফেল। কম্পার্টমেন্টাল বা সাপ্লিমেন্টারির ব্যবস্থা ছিল না। ধ্রুবদা ক'টি বিষয়ে ফেল হতেন, তা আমি জানি না। তবে তাঁর মুখেই শুনতাম, ইংরিজিতে তাঁর দুর্মর দুর্বলতা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু ইংরিজিটা কেন রয়ে গেছে এই নিয়ে ধ্রুবদার বিবিধ জ্বালাময়ী ভাষণ আমি শুনেছি। হ্যাঁ, ধ্রুবদা প্রায়ই ভাষণ দিতেন। যত দূর জানি তিনি কোনও পার্টি-টার্টি করতেন না। আলিপুরদুয়ার জংশন তখন সবে গড়ে ওঠা একটা রেল শহর। শহর না বলে কলোনি বলাই ভাল। রাস্তাঘাট হয়নি, বাজারহাট বসেনি, তেমন জনসমাগমও হয়নি। তখন মাইকের প্রচলন ছিল না, মঞ্চ তৈরি করার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু ধ্রুবদার বক্তৃতা দেওয়ার নেশা ছিল। সামাজিক বৈষম্যের যে কোনও ইস্যুতেই তিনি একটা টুল জোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতেন। অনেকে শুনত এবং অনেকে হাসাহাসিও করত।

মানুষটি বেঁটে, মোটাসোটা, ঝাঁকড়া চুল এবং বোকাসোকা পরোপকারী ভালমানুষ গোছের। মুখে সর্বদা সরল হাসি। কার মড়া পোড়াতে হবে, কার জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে, কোন বউদির জর্দা এনে দিতে হবে, কোন মাসিমার বাজার করে দিতে হবে, ধ্রুবদা এক পায়ে খাড়া। মাথা ছিল না বটে, কিন্তু পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে ধ্রুবদা গাঁকগাঁক করে পড়তেন, সারা পাড়া জানান দিয়ে। পড়া মানে টেনে মুখস্থ করা। বিশেষ করে ইংরিজি। তখন এম সেনের ইংরিজি নোটবইয়ের খুব চল ছিল। ধ্রুবদা সেই মানেবইটি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল, লিখতে গিয়ে কোনও জায়গায় আটকে গেলে বানিয়ে ম্যানেজ করতে পারতেন না। হয়তো মাঝখানে একটা শব্দ ভুলে গেছেন, তা হলে বাকিটা আর মনে পড়বে না। ওই শব্দটা ধরিয়ে দিলেই বাকিটা ফের গড়গড় করে লিখে যেতে পারবেন। তাই প্রায় বছরেই পরীক্ষায় বসে ধ্রুবদা কোনও জায়গায় আটকে গেলেই আশেপাশের ছেলেদের ধাক্কা দিয়ে বলতেন, দাদা আপনি কি এম সেন?... ও দাদা, আপনি কি এম সেন? লোকে বিরক্ত হত।

ধ্রুবদার একমাত্র শত্রু ছিলেন পোস্টমাস্টার কালিদাসবাবু। তাঁদের একটা চিঠি ভুল ঠিকানায় ডেলিভারি হওয়ায় ধ্রুবদা গিয়ে কালিদাসবাবুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন, 'আপনারা কি ইংরিজি জানেন না নাকি? পরিষ্কার ঠিকানা লেখা রয়েছে, তবু ভুল ঠিকানায় চিঠি যাবে কেন?' এক কথায়-দু'কথায় ঝগড়া লেগে যাওয়ায়

কালিদাসবাবু রেগে গিয়ে বলেন, যা যা মুখ্যু কোথাকার! ম্যাট্রিকে তো পাঁচ বার ডাব্বা খেয়েচিস, এসেছে ইংরিজি শেখাতে!

ধ্রুবদার দুর্বলতম জায়গায় আঘাত। সে বার সত্যিই পঞ্চম বার তিনি ফেল করেছিলেন। কিন্তু সমান তেজে বলেছিলেন, আপনি তো পাবলিক সারভেন্ট! আপনি আমার জুতো পালিশ করুন। এর ফলে কালিদাসবাবু তেড়ে এসে ধ্রুবদাকে 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা' বলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন।

সেই রাগে ধ্রুবদা কালিদাসবাবুর বিরুদ্ধে একটা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। প্রায়ই রেল কোয়ার্টারের অস্থায়ী সেই পোস্ট অফিসের উলটো দিকের মাঠে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ডাক বিভাগের দুর্নীতি ফাঁস করে বক্তৃতা দিতেন, পোস্ট অফিসের লোকেরা ঠিকমত চিঠি বিলি করে না, পার্সেল হাপিশ করে দেয়। লেটারবক্সে চিঠি পড়ে থাকে, ক্লিয়ারেন্স হয় না, এই সব। দু-চার জন শুনত দাঁড়িয়ে, গুরুত্ব দিত না।

কালিদাসবাবুও শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনতেন। মাঝে মাঝে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলতেন, ওরে মুখ্যু, পোস্ট অফিস বানান করতে পারিস? ধ্রুবদাও সমান তেজে জবাব দিলেন, আপনি তো টুকে পাশ করেছেন! দুজনে ধুন্ধুমার লেগে গেল ফের। ধ্রুবদা আর কালিদাসবাবুর বিবাদের কথা বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে! আর ঘটে বলেই আমাদের একঘেয়ে স্তিমিত জীবনের 'আবার খাব' সন্দেশের মতো একই ছাঁচে-ঢালা দিন-যাপনের মধ্যে নতুন বাতাসের ঝাপটা এসে লাগে। জীবন সহনীয় হয়। অঘটনটা ঘটল দু'বছর বাদে। সে বার ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরোলে দেখা গেল, ধ্রুবদা সপ্তম বারের বার থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন।

এই সংবাদে সারা আলিপুরদুয়ার জংশনে হইচই পড়ে গেল। হাটে-মাঠে-বাজারে লোকের মুখে মুখে একটাই কথা, ধ্রুব ম্যাট্রিক পাশ করেছে! সে বার আলিপুরদুয়ারের একটি ছেলে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ডও করেছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাল না। সন্ধের পর ধ্রুবদাকে নিয়ে মিছিল বেরিয়ে পড়ল। সবার সামনে গ্যাঁদা ফুলের মালা গলায় হাস্যমুখে ধ্রুবদা, তাঁর মুখের কাছে এক জন হ্যাজাক তুলে ধরে আছে। আর ধ্রুবদা হাত জোড় করে পাবলিকের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। বিশেষ করে পোস্ট অফিসের সামনে জনা পঞ্চাশেকের সেই জনতা 'ধ্রুব তপাদার জিন্দাবাদ, ধ্রুব তপাদার জিন্দাবাদ' ধ্বনিও দিল ঘন ঘন। কালিদাসবাবুর বাড়ি সে দিন নিষ্প্রদীপ ছিল।

ধ্রুবদা সেখানেই থামলেন না। কাছাকাছি কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে গিয়ে আই এ ক্লাসে অ্যাডমিশন নিয়ে এলেন। প্রবীণ কেপুবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ধ্রুব, তুমি আরও পড়বে না কি?' ধ্রুবদা বললেন, পড়ব না মানে? ম্যাট্রিকে পাশ করেছি, এখন কি আর থামা যায়?

বাস্তবিক ওই ম্যাট্রিকটাই বোধহয় ছিল ওঁর স্টাম্বলিং ব্লক। ওটা পেরিয়েই উনি রাজপথের সন্ধান পেলেন বোধহয়। তত দিনে আমরা আলিপুরদুয়ার ছেড়ে অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছি। হাওয়ায় খবর পেয়েছিলাম, ধ্রুবদা ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ, ডিস্টিংশনে বি এ পাশ করে কলকাতায় এম এ পড়তে গেছেন। তার পর আর খবর জানি না।

বেশ কয়েক বছর পর, যখন আমি একটা স্কুলে মাস্টারি করি, তখন ক্লাস ফাইভ-সিক্সে একটা ইংরেজি গ্রামার বই পাঠ্য ছিল। লেখকের নাম প্রফেসর ডক্টর ডি তপাদার। আমি অবশ্য খোঁজ করে দেখতে যাইনি যে, এই অধ্যাপক ডক্টর ডি তপাদার লোকটি আসলে কে।

গোবিন্দর গল্প

বাতাসী জেঠিমা প্রায়ই কাঁচুমাচু মুখে এসে জিজ্ঞেস করতেন, অরে, গোবিন্দরে দেখছস?

না তো জেঠিমা, গোবিন্দরে তো সকাল থিক্যাই দেখি নাই।

হারামজাদা পোলা যে কই গেল!

ব্যাপারটা নতুন নয়। গোবিন্দ হাড়ে হারমাদ, প্রচণ্ড বদমাশ এবং বেপরোয়া। সকাল থেকেই সে তাদের দরিদ্র কুটিরের অকিঞ্চনতা থেকে বেরিয়ে পড়ে। কখনও ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শম্ভুগঞ্জে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও পাটের নৌকোয় উঠে ভেসে যায় দিগন্তে, কখনও উধাও হয়ে কেওটখালিতে গিয়ে কী করে, তা সে-ই জানে! মাঝে মাঝে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আসত। গায়ে দেখা যেত কাটা-ছেঁড়া-কালশিটে। বিস্তর মার খেত এবং মারত।

কালিকাজ্যাঠা বড্ড ভালমানুষ গোছের। পুজোপাঠ করে তাঁর সংসার চলত। কিংবা চলত বলাও ঠিক হবে না। অভাবের সংসারে খিটিমিটি লেগে থাকত নিত্যি, চার ছেলেমেয়ে নিয়েই তাঁদের সংসার নয়, আরও গোটা দুয়েক পুষ্যি ছিল তাঁদের। কালিকাজ্যাঠার বিধবা বোন মাখনী, আর এক জ্ঞাতি আধপাগল পরাণ। শুধু কাঁঠালবিচি সেদ্ধ দিয়ে যে ভাত খাওয়া যায়, এটা আমি তাঁদের বাড়িতেই দেখেছি।

গোবিন্দকে নিয়ে তাঁদের ছিল লাগাতার সংকট। পাড়াপড়শিরা প্রতি দিন ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ জানিয়ে যেত। কিন্তু গোবিন্দর নাকে দড়ি পরানোর মতো জোরালো মানুষ সেই পরিবারে ছিল না। কালিকাজ্যাঠা মাঝে মাঝে তর্জনগর্জন করতেন বটে, কিন্তু সেটা সিংহনাদের মতো শোনাত না, বরং গরুর হাম্বার সঙ্গে খানিকটা মিল ছিল। মাঝে মাঝে বলতেন, ব্রাহ্মণের তো তিনখান কাম। কানে ফুঁ, শঙ্খে ফুঁ আর চুলায় ফুঁ। কিন্তু ওই নিব্বইংশার পো'র তো হেই যোগ্যতাও নাই।

বলা বাহুল্য, গোবিন্দ পড়াশুনোয় নিতান্ত গাড্ডু। ইস্কুলে তার নাম লেখানো ছিল। কিন্তু কদাচিত্ স্কুলে যেত সে। পুজোর ক্রিয়াকর্মাদিও সে তেমন শেখেনি। ফলে, কানে ফুঁ মানে লোককে মন্ত্র দিয়ে বেড়ানো, শঙ্খে ফুঁ মানে পুজো-আচ্চা করে দিন গুজরান, আর চুলায় ফুঁ মানে বাড়ি বাড়ি রান্না করে অন্নের সংস্থান, কোনওটাই তার হওয়ার নয়।

তবে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ এক বস্তা বেগুন মাথায় করে নিয়ে আসত। কিংবা চুবড়ি-ভর্তি মাছ। কিংবা এক পাঁজা আখ, বোঝা যেত চুরি করে এনেছে। কালিকাজ্যাঠা রাগারাগি করতেন। কিন্তু বাতাসী জেঠিমা

বলতেন, চুরি কইরা আনবো ক্যান? গোবিন্দরে লোকে ভালবাইস্যা দ্যায়।

অন্য গুণ না থাক, গায়েগতরে আলিশান ছিল গোবিন্দ। বেশ লম্বা-চওড়া, ফরসা। মাথায় কোঁকড়া চুল এবং মুখে নিষ্পাপ হাসি। বদমাশ বলে তাকে বিন্দুমাত্র বোঝা যেত না।

সে বার মুক্তাগাছার জমিদার বীরভদ্রবাবুর বুড়ি পিসি চিকিত্‌সা করাতে এসে আমাদের বারবাড়ির মস্ত কাছারি ঘরটায় ছিলেন। চোখে ভাল দেখেন না, কানেরও দোষ আছে, সঙ্গে এক জন সব সময়ে দেখাশোনা করার দাসী ছিল। আর কেউ না।

এক দিন সন্ধের পর দাসীটি আমাদের ঘরে এসে গল্পটল্প করছিল। হঠাৎ বাইরে কাছারি ঘর থেকে চিল-চেঁচানি শোনা গেল, 'আরে, লইয়া গেল! লইয়া গেল! অরে, তরা ধর হারামজাদারে, ধর...'

লোকজন, আলো এলে দেখা গেল, পিসির গলার দশ ভরির হারখানা নেই। চওড়া হার, চোরও ধুরন্ধর। হ্যাঁচকা টান মেরে ছিনতাই করেনি। বরং পিসির শিয়রের কাছে বসে কুশল প্রশ্নাদি করেছে এবং শেষে অতিশয় যত্নের সঙ্গে হুক খুলে হারটা নেওয়ার সময় পিসি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিল, আরে করস কী? করস কী? চোর সস্নেহে বলেছে, ভারী হার গলায় রাখনের কাম কী পিসিমা? খুইলা এই বালিশের পাশে রাইখা দিলাম।

তখনকার দারোগা-পুলিশ স্বদেশি সামলাতে ব্যস্ত। চুরির ব্যাপারে তেমন তৎপর নয়। তবু তারা আসে। সন্দেহবশে গোবিন্দকে ধরেও নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুই হয়নি শেষ অবধি।

সেটা বোধহয় চতুর্থীর দিন। হঠাৎ বিকেলের দিকে গোবিন্দ একটা ছোট্ট দুই কি আড়াই ফুট লম্বা ভারী সুন্দর দুর্গামূর্তি ঘাড়ে করে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে তুমুল চেঁচামেচি। কালিকাজ্যাঠা বাড়ি মাথায় করে চেঁচাচ্ছিলেন, সর্বনাশ হইছে। এ যে মহাপাতক হইয়া পড়ল। নির্ব্বইংশার পো, এইটা করলি কী? পূজাকাটাইল্যা দিনে মায়ের মূর্তি লইয়া আইছস? পূজা না হইলে যে সর্বনাশ, বংশ থাকব না!

বাতাসী জেঠি, মাখনী পিসিও কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। অমঙ্গলের ভয় বড় ভয়।

নির্বিকার শুধু গোবিন্দ। দুর্গামূর্তি দাওয়ায় রেখে সে বুক চিতিয়ে বলল, আমি পূজা করুম।

কালিকাজ্যাঠা খড়ম তুলে তাকে মারতে গেলেন। বললেন, চাইর দিনের পূজা কি ফাইজলামি নাকি রে গর্ভস্রাব? জোগাড়যন্তর করে কে? বাপের জমিদারি পাইছস?

ঠিক এই সময় আসরে অবতীর্ণ হলেন আমার ঠাকুমা। তিনি বললেন, অশান্তির কাম নাই ক্যালকা। মূর্তিখান আমাগো বারান্দায় দিয়া যাও। আইন্যা যখন ফালাইছে, তখন পূজা করনই লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থলু পড়ে গেল। নানা দিকে লোক ছুটল এবং প্রায় রাতারাতি আমাদের বারবাড়ির মাঠে বাঁশ-বাখারি ত্রিপল দিয়ে দিব্যি পূজার মণ্ডপ তৈরি হয়ে গেল। চলে এল চাঁদমালা, রঙিন কাগজ, হ্যাজাক।

বাড়ির মেয়েরা বসে গেল রঙিন কাগজের শিকলি বানাতে। ঝুড়িভর্তি ফল, ফুল, ভোগের চাল, ডাল, তরকারি এসে যেতে লাগল মুটের মাথায়।

সে কী আনন্দ আমাদের! দেবদারু পাতা, রঙিন শিকলি, চাঁদমালায় সজ্জিত মণ্ডপে যখন সেই একরত্তি, কিউট ও ভারী সুন্দর মূর্তিটি বসানো হল তখন যেন আলো হয়ে গেল চার দিক।

চোর হোক, বদমাশ হোক, গোবিন্দর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ওর জন্যই আমাদের বাড়িতে সেই থেকে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছিল।

জগুদা

জগুদা হেনার প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হল, হেনা পড়েনি। বস্তুত সে জগুদাকে চিনতই না। জগু বলে যে কেউ এই ধরাধামে আছে এবং সে যে হেনার জন্য পাগল, এ খবরটাও জানা ছিল না হেনার। হেনা তখন এইট বা নাইনের ছাত্রী। বেণি দুলিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বকবক করতে করতে রোজ বেলা সোয়া দশটায় বিধানপল্লীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে ইস্কুলে যায়।

তখন সবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে উদ্বাস্তুরা বসতি করেছে যাদবপুর অঞ্চলে। বিজয়গড়, বিধানপল্লীতে জবরদখল করা জমিতে কোনও ক্রমে খাড়া করা আশ্রয়। বেশির ভাগই টিনের চালওয়ালা ঘর। আমার পিসিমার বাড়িটা ছিল রাস্তার ওপর। আর জগুদারা থাকত একটু ভিতরের দিকে। সদ্য মাটি খুঁড়ে তৈরি করা একটা পুকুরের ও-পাশে। সেখান থেকে স্কুলযাত্রী হেনাকে দেখা যায় না। তাই দশটার মধ্যেই জগুদা চলে আসত আমার পিসিমার বাড়িতে। তার পর বারান্দায় বসে হাঁ করে চেয়ে থাকত। পিসিমা তরকারি কুটতে কুটতে নানা রকম কথা বলত। জগুদা উলটোপালটা জবাব দিত। কিংবা মোটেই জবাব দিত না। কথা কানেই ঢুকত না তার।

প্রথম প্রথম পিসিমা কিছু বুঝতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু রোজ একই ঘটনা ঘটলে ধরা পড়ার ভয় থাকেই। তাই পিসিমা এক দিন বলেই ফেলল, হারামজাদা, বেয়াক্কেইল্যা, খাউজ্যানি উঠছে বুঝি তর? মাইনকা চিপি কারে কয় জানস? মাইনষে যখন ধইরা বাঁশডলা দিব তখন ট্যার পাবি।

জগুদা অবশ্য সে সব সতর্কবার্তা গায়ে মাখেনি। প্রেমে পড়লে কারই বা কবে ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান থাকে? তার জগৎ তখন হেনাময়। এক বার বোধ হয় জ্বরটর কিছু হয়ে হেনার তিন দিন কামাই গেল। জগুদার সে কী ছটফটানি! তার পর যখন হেনাকে তিন দিন বাদে দেখা গেল, আত্মহারা জগুদা 'আইছে! আইছে!' বলে এমন উল্লাস প্রকাশ করেছিল যে, পিসিমা তাকে দরজার বাটাম নিয়ে তাড়া করে।

কলোনির ঘরে ঘরে তখন টানাটানির সংসার। বড় বড় ছেলেরা বেকার বসে আছে। হা-ভাত জো-ভাত অবস্থা। নিত্যি রাজনৈতিক মিটিং হয়। মিছিল বেরোয়। ডোল নামক সরকারি সাহায্য এবং রেশন নিয়ে মারপিট। সেই আকালে ম্যাট্রিক পাশ জগুদা একটা ব্যাংকে পিওনের কাজ পেয়ে গেল। পাকা চাকরি নয়, টেম্পোরারি। যৎসামান্য বেতন। কিন্তু তখন সেটাও হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ঘটনা। আর জগুদার মনে হল, চাকরি যখন পেয়েছি, তখন আর হেনাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়?

জগুদার মা, অর্থাৎ উত্তমী জেঠিমা নিতান্তই ভালমানুষ গোছের। দুনিয়ার প্যাঁচঘোঁচ তেমন বোঝেন না। জগুদা তার মাকেই জপিয়ে নিয়ে হেনাদের বাড়িতে পাঠাল বিয়ের প্রস্তাব করতে।

কিন্তু হেনাদের অবস্থা ভাল। তার বাবা কলেজের অধ্যাপক। আর হেনার বয়সও তখন মাত্র চোদ্দো-পনেরো। ব্যাংকের পিওন, তেমন কন্দর্পকান্তি নয় এবং কোনও বিশেষ গুণও তার নেই— জগুদা পত্রপাঠ নাকচ হয়ে গেল। ভদ্র ভাবেই এক রকম ঘাড়ধাক্কা খেয়ে এল উত্তমী জেঠিমা।

এই হেনস্তার কথা কলোনিতে মোটেই চাপা থাকল না। চার দিকে হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রুপ এবং ছিছিক্কারের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। রাগে-অপমানে জগুদা প্রথমে আত্মহত্যা, তার পর মদ খেয়ে দেবদাস এবং আরও পরে বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে চরিত্রহননের চেষ্টা করতে লাগল। কোনওটাই হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। অফিস থেকে হুমকি দেওয়া হল, বেশি কামাই হলে চাকরি যাবে। সুতরাং জগুদা সামলে গেল।

জগুদার কাকা মাখন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল মস্তান গোছের লোক। তার ওপর কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরির ইউনিয়নের পান্ডা। রোখাচোখা মানুষ। সে এসে এক দিন উত্তমী জেঠিমাকে বলল, জউগ্যার একটা বিয়া দিয়া দাও বউঠাইরেণ। হাতে ভাল এউকগ্যা মাইয়া আছে।

বাঙালি বিয়ে করতে ভালবাসে। এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ। অন্য অনেক বিষয় অনাসক্তি থাকলেও বিয়ের কথায় বাঙালি খানিকটা উজ্জীবিত হয়। ‘খাব না খাব না অনিচ্ছে’ ভাবখানা বজায় রেখেও গোমড়া মুখে এক দিন জগুদা বিয়ে করতে চলেও গেল। কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় টোপর, মুখে লাজুক হাসি। আমরা বরযাত্রী।

বিস্ময়টা অপেক্ষা করছিল বিয়েবাড়িতেই। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের অতি সামান্য আয়োজন। প্যান্ডেল করার পয়সা নেই বলে ভাগের উঠোনে একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে বিয়ের আসর। আপ্যায়নের ব্যবস্থাও খুব সুবিধের নয়। কিন্তু আমরা অবাক পাত্রী দেখে। গায়ের রংটা তেমন ফরসা নয় বটে, কিন্তু কী অপূর্ব মুখশ্রী! দীঘল চোখ, ঢলঢলে লাবণ্যে ভরা মুখ, চুলের গোছও সাংঘাতিক। বেনারসি জোটেনি বলে প্লাস্টিকের জরিওলা শাড়ি পরেছে। তবু মনে হচ্ছে রাজরানি।

জগুদা বিয়ে করে এল। কিন্তু মুখে উদাস দেবদাস-দেবদাস ভাব। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার কাছে এ তো আত্মহত্যাই হল।

পিসিমা বউ দেখে এক দিন জগুদাকে ডেকে বলল, নিজের বউখানরে ভাল কইরা দ্যাখছস নি হারামজাদা? কোন পেতনিরে পছন্দ করছিলি রে ভূত!

কিন্তু জগুদা পাক্কা সাত দিন উদাস ভাবখানা বজায় রাখল। তার পর এক রবিবার নতুন বউদি যখন স্নান করতে পুকুরে নেমেছে, তখন জগুদাকে আমরা পাকড়াও করলাম পাশের কলাঝোপের আড়ালে উঁকি-মেরে-

থাকা অবস্থায়। জগুদার তখন লজ্জায় পাতাল-প্রবেশের অবস্থা। জগুদা কয়েক দিন পর ফের ধরা পড়ল অফিসের ব্যাগে করে বউয়ের জন্য কবিরাজি কাটলেট লুকিয়ে আনতে গিয়ে।

তার পর যা হল, বলবার নয়। জীবনে আমি বিস্তর স্ত্রৈণ দেখেছি। বলতে কী, বাঙালিদের মধ্যে স্ত্রৈণরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু জগুদার মতো আর দেখিনি।

পরবর্তী দু'বছরও পিসিমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেনা স্কুলে গেছে এবং এসেছে। কিন্তু তার জন্য হাঁ করে আর জগুদাকে বসে থাকতে দেখা যায়নি। বাঙালি পুরুষগুলো এ রকমই!

খোকাকাকু টি টি

তিনি যখন ভাত খেতেন তখন বাস্তবিকই কোঁত কোঁত করে শব্দ হত। খেতেন আর চার দিকে তাকাতেন, কেউ দেখে ফেলছে কি না। যাদের খোরাক কিছু বেশি, তাদের একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকে। তাঁরও ছিল। বেশ বড় বড় গ্রাস ছিল তাঁর। পাঁচ-সাতটা বড় বড় মাছের টুকরো চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেত। সবাই দেখত। এ রকম খাইয়ে লোকের খাওয়া কি না দেখে থাকা যায়? তবে গৃহস্থকে বিপদে ফেলতেন না। বৃহৎ একটি মৎস্যখণ্ড তিনি নিজেই কিনে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন।

খোকাকাকু ছিলেন রেলের টিকিট চেকার। পাতলুনের ঝুল কিছুটা কম থাকতই তাঁর। কালো কোটের ধাতব বোতাম একটা-দুটো সর্বদাই মিসিং। ঘন ভ্রু, কানে বড় বড় লোম, মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখে অতি সরল বোকা-হাসি, যা দেখে মনে হতে পারত যে, ইনি মস্তিষ্কের চর্চা বিশেষ করেন না। বলতে কি, খোকাকাকু তা করতেনও না। যখন চা খেতেন, তখন চায়ে চুমুকের যে শব্দ হত, তা আশপাশের ঘর থেকেও শোনা যেত।

অ্যাক্টিভিটি ছিল। কিন্তু খোকাকাকু বিশেষ বলিয়ে-কইয়ে মানুষ ছিলেন না। আর বললেও তাঁর কথা বিশেষ বোঝা যেত না। কারণ মুখে সর্বদাই থাকত পান আর কড়া গন্ধের জর্দা। একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া পানহীন খোকাকাকুকে আমরা কখনও দেখিনি। কখনও হয়তো সকালে লুচি-তরকারি জলখাবার দেওয়া হয়েছে। উনি মুখ থেকে পানের ছিবড়েটা বের করে বাঁ হাতে মুঠো করে রাখতেন। জলখাবারের শেষে সেই ছিবড়েই ফের মুখে দিয়ে আরামে চিবোতেন।

আলিপুরদুয়ার জংশনের কাছাকাছি নানা ব্রাঞ্চ লাইনে তাঁর ডিউটি থাকত। তাঁর কোয়ার্টার ছিল বোধহয় মাল জংশন বা অন্য কোথাও। তাঁর পরিবারকে আমি কখনও দেখিনি। তিনিও পরিবারের কথা বিশেষ ফেঁদে বলতেন না। কথার কারবারি ছিলেন না। মাঝে মাঝে ওই লাইনে ডিউটি পড়লে আত্মীয়তার সূত্রে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতেন। হাতে সর্বদাই অন্তত সের দেড় বা দুইয়ের রুই বা কাতলার টুকরো, পাটের দড়িতে ঝোলানো। এসেই ঠাকুমা আর মা'কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। আমার বাবা ছিলেন তাঁর ওপরওয়ালা এবং রাশভারী মানুষ। তাই খোকাকাকু তাঁর সম্মুখীন বিশেষ হতেন না।

আমাদের বাড়িতে রেলতুতো অতিথির কোনও অভাব ছিল না। মা'কে অসময়ে উনুন জ্বালিয়ে বাড়তি রান্না করতে যে কত দিন দেখেছি, তার হিসেব নেই।

খোকাকাকুর আনা মাছ রান্না করে তার বেশির ভাগটাই খোকাকাকুকেই খাইয়ে দিতেন মা। তিনিও অম্লানবদনে খেয়ে নিতেন।

খোকাকাকুকে আমরা কখনও মাতলামি করতে দেখিনি। কিন্তু সন্ধের পর তিনি যে একটু ঢুকুঢুকু করতেন, এ আমরা সবাই জানতাম। ঠাকুমা মাঝে মাঝেই বলতেন, খোকা রে, ওই ছাইভস্মগুলি আর খাইছ না। খোকাকাকু সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বলতেন, আর খামু না। এবং আবার খেতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই খোকাকাকুই এক মাসের জন্য ঘুষ খাওয়া এবং মদ্যপান নাটকীয় ভাবে বন্ধ করে দেন বলে শুনেছিলাম। এক দিন এক কামরায় উঠে তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ভাইসব, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা এখন স্বাধীন নাগরিক। দেশের প্রতি আমাদের পবিত্র কর্তব্য রয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে আর ঘুষ খাব না। আপনারাও প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে আর বিনা টিকিটে রেলে চড়বেন না। দিন, আপনারা যাঁরা বিনা টিকিটের যাত্রী আছেন, সবাই আজ ফাইন দিন।

তাতে অনেক যাত্রীই অশ্রুবিসর্জন করলেন। অনেকে আবেগের বশে ফাইনও দিয়ে দিলেন। কামরায় কামরায় সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। খোকা চেকারের বেশ নামডাকও হয়ে গিয়েছিল। তিনি মদ্যপান বন্ধ করে জর্দাপান ধরলেন। আর ঘন ঘন সিগারেট। সংযম ও আত্মত্যাগের এক দৃষ্টান্তই প্রায় স্থাপন করে ফেলেছিলেন তিনি।

এক মাস তো বড় কম সময় নয়। সংযম ও আত্মত্যাগ এক মাস বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু মুশকিল হল, ভারতীয় রেলে বরাবরই বিনা টিকিটের যাত্রীর আধিক্য এবং রমরমা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকের ধারণা হয়েছিল, এ তো এখন আমাদের রেল। টিকিট কাটতে যাব কোন দুঃখে? সুতরাং এই বিপুল, সংখ্যাগরিষ্ঠ অবৈধ যাত্রীর মিলিত শক্তির কাছে এক জন টিটি আর কতটুকু? তবু কালো কোটের মহিমাকে সম্মান জানাতে তারা চার আনা, আট আনা বাঁ হাতে দিতে রাজি। কিন্তু টিকিট কাটা তাদের ধাতে নেই।

সুতরাং মাসখানেকের শুখা কেটে আবার ঘুষের স্নিগ্ধ বর্ষণ নেমে এল। খোকা-টিটি ফের ঘুষ নিতে শুরু করলেন। তাতে পকেট খুশি, হাত খুশি, মনও ফুরফুরে, বিকেলে তৃষ্ণা মিটিয়ে ফের মদ্যপানও শুরু হয়ে গেল। অনেকেই তখন বলতে শুরু করল যে, দেশটা যে স্বাধীন হয়েছে, এটা তারা বুঝতে পারছে না। কথাটা আজও অনেকের মনে হয়। দেশটা যেন বেহাত হয়ে গিয়েছে। কারা চালাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। খোকা-টিটির আর দোষ কী!

আজও যেন খোকাকাকুকে স্পষ্ট দেখতে পাই। কোঁত কোঁত করে খাচ্ছেন আর চার দিকে তাকাচ্ছেন, কেউ দেখে ফেলছে কি না।

মনোহরপুকুরের সেই বাড়ি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার কিছু দিনের মধ্যেই বাবা রেলের চাকরি পেলেন। ক্রু ইন চার্জ। আর আমরা ময়মনসিংহ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। মনোহরপুকুরে যদু ঘোষের বাড়ির দোতলায় আমাদের বাসা। দুটি মাত্র ঘর। সামনে দুটো ছোট ছোট ওপেন টেরাস, পিছনে বারান্দা, কলঘর। দিব্যি বাড়ি। কোনও আসবাবপত্র ছিল না তখন আমাদের, মেঝেয় বিছানা করে শোওয়া হত। দিনে ফাঁকা ঘরে আমি ট্রাইসাইকেল চালাতাম।

তখন আমার বয়স বছর চারেক বোধহয়। তখনও মায়ের দুধ খাই। আর ভীষণ দুষ্টু আর চঞ্চল। আমাকে শান্ত রাখতে মা দুপুরে মাদুর পেতে পাশে নিয়ে শুয়ে আমাকে মহুয়া, বলাকা থেকে কবিতা শোনাত। আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার চেয়ে দু'বছরের বড় দিদি তখন কর্পোরেশন স্কুলে পড়তে যেত।

পাড়াটি ছিল ভারী শান্ত, নিরিবিলি। অনেক তাল আর নারকোল গাছ ছিল, পুকুর ছিল— যাতে সারা দিন কয়েকটা মোষ গা ডুবিয়ে বসে থাকত। চিল ছিল, বাদুড় ছিল, পেঁচা ছিল, চড়াই বা শালিখ বা টিয়ারও অভাব ছিল না। আর যুদ্ধের কারণে তখন ব্ল্যাক-আউট ছিল বলে ল্যাম্পপোস্টে ঠুলি লাগানো থাকত, ঘরেও সাইরেন বাজলে আলো নিবিয়ে রাখতে হত। বাড়ির সামনে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল, তার মধ্যে আমরা লাফ দিয়ে দিয়ে নামতাম আর হাঁচোড়পাঁচোড় করে উঠতাম। ভারী মজার খেলা।

সেই পাড়ায় আসার পরই পড়শিদের সঙ্গে দিব্যি আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়ি, ও বাড়িতে খুব যাতায়াত, পরনিন্দা, পরচর্চা চলত। কারও কোনও খবরই গোপন থাকত না বড় একটা। আর কে জানে কী ভাবে সব বাড়িতেই আমাকে ডেকে নিত। সুতরাং প্রায় সব বাড়িতেই ছিল আমার অকুণ্ঠ যাতায়াত, আর ওই ভাবেই ভাব হয়েছিল টেকো বাড়ির মানুষদের সঙ্গেও।

টেকো বাড়িতে চার জন মোটে প্রাণী: বুড়ো, বুড়ি, আর আছেন দুজন যুবতী মেয়ে। টেকো বাড়ি নামটা কে দিয়েছিল তা জানা নেই। তবে সবাই টেকো বাড়িই বলত, কারণ সেই বাড়ির বুড়ো আর বুড়ির মাথায় টাক, দুটি মেয়েরও যুবতী বয়সেই মাথার চাঁদিতে দিব্যি টাকের লক্ষণ। দুই মেয়ের বয়স তখন অনুমান পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। কোনও কারণে তাঁদের বিয়ে হয়নি। তাঁরা ঘরের বাইরে কদাচিৎ বেরোতেন।

টেকো বুড়ো ছিলেন বিখ্যাত কৃপণ। কয়েক দিন যাতায়াতের পরই এক দিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়িতে মাসে কয় সের তেল লাগে বল তো?

তথ্যটা আমার জানা ছিল না বলে বললাম, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি?

যা জিজ্ঞেস করে আয়।

দৌড়ে গিয়ে মাকে বললাম, মা, মাসে কয় সের তেল লাগে?

মা অবাক হয়ে বলে, কেন রে?

টেকো দাদু জানতে চাইছে।

মা হেসে বলে, তিন সের।

তিন সের শুনে টেকো দাদুর মাথায় হাত, সর্বনাশ! তোর মা কি তেল দিয়ে আঁচান?

টেকো দাদু সকালে বাজারে যেতেন না। তখন নাকি সব জিনিসের দাম বেশি থাকে। বেলায় গিয়ে ঝড়তিপড়তি আনাজ বেশ সস্তায় কিনতেন। পেট নরম হয়ে যাওয়া চুনো মাছ কিনতেন রোজ। আর তাদের বাড়ি থেকে সর্বদাই একটা পচা মাছ রান্নার গন্ধ পাওয়া যেত।

মেয়ে দুটিকে আমি পিসি ডাকতাম। তা সেই দুটি টেকো পিসি তখনও পড়াশুনো করতেন। কী পড়তেন তাঁরা জানি না। কিন্তু দেখতাম, তাঁরা কাগজের বদলে পুরোনো খবরের কাগজে দোয়াতের কালি আর হ্যান্ডেলে সস্তা নিব পরানো কলমে লিখতেন।

সব বাড়িতেই আমি গেলে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য জুটে যেত। কেউ বিস্কুট, কেউ বা মোয়া কিংবা নাড়ু, রসগোল্লা বা কালোজাম কিছু না কিছু দিত, শুধু টেকো বাড়িতেই কিছু জুটত না।

তবে দুই পিসি আর টেকো দিদা আমাকে কম ভালবাসতেন না। গেলে কাছে বসিয়ে কত গল্পই না করতেন।

কিন্তু টেকো দাদু একটু অন্য রকম। তিনি এক দিন জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কত মাইনে পায় জানিস?

এটা আমার জানা ছিল। বাবা আর মায়ের কথাতেই শুনেছি, এ বাজারে নাকি আশি টাকায় সংসার চলে না।

আমি বললাম, আশি টাকা।

আশি! আশি? সে তো অনেক টাকা রে! অ্যাঁ! আশি! বলে কী?

তখন আশি টাকায় বিস্ময় বোঝার বয়স আমার হয়নি। কিন্তু বুঝেছিলাম, আশি টাকাটা বোধহয় অন্যায্য রকমের একটা বাড়াবাড়ি।

মা'কে এসে ব্যাপারটা বলতেই মা হেসে ফেলেছিল। তার পর বলল, কৃপণ হলেও লোকটা তো আর এলেবেলে নয়। ফিলজফির এম এ।

পরে শুনেছিলাম, আমার দুই টেকো পিসিও খবরের কাগজে লেখা নোট পড়ে পড়ে দর্শনশাস্ত্রে অতি কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেছিলেন। বইপত্র জুটত না তাঁদের, ধারেকাছে তেমন লাইব্রেরিও ছিল না। কী ভাবে সে সব অভাব পূরণ করতেন কে জানে!

সতীশবাবু

হেডস্যর সতীশবাবু আমাদের অঙ্কের ক্লাস নিতেন। বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি জোরালো গলা, আর তীক্ষ্ন ও তীব্র চোখ। ভয়ে গোটা স্কুল সিঁটিয়ে থাকত। সতীশবাবু মানেই সকলের থরহরিকম্প। মারধর কদাচিত্ করতেন, অন্তত আমি বছর দুইয়ের মধ্যে তাঁকে মারধর করতে দেখিনি। তার দরকারও হত না। স্কুলের শুরুতে এক বার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খোলা বারান্দার কোণে দাঁড়াতেন, তাতেই গোটা স্কুল একদম চুপ মেরে যেত। ও রকম প্রবল ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তাঁকে নীরস মানুষ বলার উপায় নেই। গল্প করতে বড়ই ভালবাসতেন।

তিনি নিতেন জ্যামিতির ক্লাস। ক্লাসে এসেই হয়তো ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে একটা সাদা বৃত্ত এঁকে ক্লাসের দিকে তাকাতেন। অর্থাত্, কেমন হল? বাস্তবিক তাঁর বৃত্ত আঁকা ছিল প্রায় নিখুঁত, কম্পাস ছাড়াও যে অমন বৃত্ত আঁকা যায় তা ভাবতে পারতাম না। সতীশবাবুর দুর্বলতার কথা আমাদের ভালই জানা ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ এক জন হঠাত্ বলে উঠতাম, ওঃ স্যর, দারুণ! সতীশবাবু ভ্রু তুলে বলতেন, কে কী বললি রে? দাঁড়া! মন্তব্যকারী তখন মুখে মুগ্ধতা ফুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলত, বৃত্তটার কথা বলছি স্যর! একদম নিখুঁত।

সতীশবাবুর তোম্বা মুখে হাসির ঝিলিক দেখা যেত। এই পুজোয় তিনি সর্বদাই তুষ্ট হতেন। আর সেই যে গল্প শুরু করে দিতেন তার তোড়ে সে দিনের মতো জ্যামিতি ভেসে যেত। গল্প মানে কোচবিহারের নানা অতীত ঘটনার স্মৃতিচারণ, যার মধ্যে তাঁর ও আরও নানা জনের নানা কৃতিত্বের কথা থাকত। কে ভাল সাইকেল চালাত, কে ক্রিকেটে নাম করেছিল, কে ছিল ফুটবলের দিকপাল, এই সব।

তার মানে এ নয় যে তাঁর সব ক্লাসই ছিল ফাঁকির ক্লাস। যখন জ্যামিতি পড়াতেন, তা-ও ছিল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এত ভাল বুঝিয়ে দিতেন, বই পড়ার দরকারই হত না।

আমার প্রতি তাঁর একটু স্নেহ হয়েছিল, ক্রিকেটের মাঠে। গেম স্যর অরুণ লাহিড়ি এক জন সত্যিকারের উঁচু জাতের প্রশিক্ষক ছিলেন। বিকেলের দিকে, ক্লাস শেষ হওয়ার পর, তিনি আমাদের মতো কয়েক জনকে বেছে নিয়ে প্র্যাকটিস করাতেন স্কুলের ভিতরকার মাঠে। তাঁর কাছে সত্যিই কিছু শিখেছিলাম। আর ওই প্র্যাকটিসের সময় মাঝে মাঝে হেডস্যর সতীশবাবুও নেমে পড়তেন ব্যাট করতে। হ্যাঁ, তিনি শুধু ব্যাটই করতেন। গেম স্যর বল করতেন, আমরা ফিল্ডিং করতাম। বলতে নেই, সতীশবাবুর মারের যা জোর ছিল তা ভয়াবহ। ধুতির ওপর প্যাড পরে খেলতেন, অমিতবিক্রমে। ক্যাচ তুললেও মারের জোর ছিল বলে ক্যাচ

ধরা ছিল শক্ত, দু-চার বার আমিই যা শুধু তাঁর শক্ত ক্যাচ ধরে ফেলতাম, আর তিনি মাঠ কাঁপিয়ে বলে উঠতেন, সাবাস! পিঠ চাপড়ে বলতেন, সাহস আছে তোর।

স্কুলের মধ্যেই এক ধারে স্কুলের হস্টেল। আমরা জনা পনেরো-কুড়ি ছাত্র হস্টেলে থাকতাম। এর মধ্যে ফেল করা কিছু সিনিয়র ছাত্রও ছিল। তাদের মধ্যেই কিছু গন্ডগোল হয়ে থাকবে। সতীশবাবু ভয়ংকর চটে গিয়ে এক সন্ধেবেলা আমাদের সবাইকে মাঠের মধ্যে লাইন আপ করিয়ে রেখে রোষকষায়িত লোচনে তাকিয়ে দাবড়াচ্ছিলেন। তার মধ্যে হস্টেল বন্ধ করে দেওয়া এবং সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও ছিল। হঠাত্ একটা বাক্য বলেছিলেন, যার মধ্যে 'একস্ট্রাভ্যাগান্ট' কথাটাও ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, বল তো একস্ট্রাভ্যাগান্ট কথাটার মানে কী? কেউ বলতে পারেনি। শুধু আমি ভয়ে ভয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলাম, অমিতব্যয়ী। আশ্চর্য মানুষ! একটা ইংরিজি শব্দের অর্থ বলতে পারায় বেজায় খুশি হয়ে তিনি প্রসন্নমুখে সবাইকে সেবারকার মতো ক্ষমা করে দিলেন।

কক্ষনও ইংরিজিতে সই করতেন না। অফিসের কাজে কী করতেন জানি না, কিন্তু আমাদের ছুটির দরখাস্তে সর্বদাই বাংলায় লিখতেন, স চ ভৌ। সতীশ চন্দ্র ভৌমিক।

ওই মোটাসোটা থলথলে শরীর নিয়ে এক বার তাঁকে স্কুলেরই একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে মালকোঁচা মেরে ফুটবলও খেলতে দেখেছিলাম। অবাক কাণ্ড, ওই শরীরেও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে তিনি এত জোরে দৌড়ে বল কভার করছিলেন যা অবিশ্বাস্য। বোধহয় ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের ম্যাচ ছিল সেটা। খেলার শেষে আমরা যখন তাঁর খেলার ভূয়সী প্রশংসা করছিলাম, তখন শিশুর মতো কী দেমাকের হাসি! হাসতে হাসতেই বললেন, খেলায় কত বার পায়ে পা লাগিয়েছিস, পেন্নাম করলি না যে বড়! অমনি আমরা ঢিব ঢিব করে প্রণাম করে ফেললাম।

আমরা পাশ করে চলে এলাম। তারও কয়েক বছর পর শোনা গিয়েছিল, স্কুলের ম্যানেজমেন্ট থেকে সতীশবাবুর বিরুদ্ধে কী সব অভিযোগ উঠেছে, তহবিল তছরুপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি। তিনি সাসপেন্ড হয়ে আছেন।

অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু আমরা দূর থেকে আর কীই বা করতে পারি। শেষে শোনা গেল তাঁর চাকরি গেছে। শুনে বড্ড দুঃখ পেয়েছিলাম। ও রকম এক জন মানুষ যে কোনও স্কুলেরই সম্পদ। যাই হোক, সতীশবাবু স্কুলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করেন। আর তাঁকে সসম্মানে হেডমাস্টারের চাকরিতে বহাল করে চা-বাগানের একটা স্কুল। সতীশবাবু সেখানেই তাঁর বাকি কর্মজীবন কাটিয়ে দেন।

মামলার কী ফল হয়েছিল, আমি আজও জানি না। আমার মনে হয়, ও রকম এক জন মানুষকে হেনস্তা করার সুযোগ হীনতর মানুষেরা সহজে ছাড়ে না। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে আমাকে অনেক স্কুলে পড়তে হয়েছে। নিজেও বেশ কয়েক বছর শিক্ষকতা করেছি। কিন্তু ও রকম হেডস্যার আর দ্বিতীয় দেখিনি।

প্রাণটুক লইয়া আছি রে বাবা

সবে দেশভাগ হয়েছে। সে বড় অরাজকতার সময়, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে প্রত্যন্ত গাঁয়েগঞ্জে মানুষের কোনও নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তাও নেই। আমাদের দেশের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে মুন্সিগঞ্জের বানিখাড়া গ্রাম, থানা টঙ্গিবাড়ি। সেই বাড়িতে তখন মেলা লোক। আমার সম্পর্কিত কাকা, জ্যাঠা, দাদু এবং কাকিমা, জেঠিমা, ঠাকুমা, দুজন বালবিধবা ঠাকুমা এবং কুমারী মেয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যুবক নিয়ে সে অনেক মানুষ। কিন্তু প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত। পাকিস্তান ব্যাপারটাই তারা তেমন বুঝতে পারছে না।

মাতব্বররা পরামর্শ দেন উলটোপালটা। কেউ বলেন, না হে, দ্যাশে থাকন যাইব না। কেউ বলেন, আরে, ভাগাভাগি তো কাগজপত্রে, আমাগো দ্যাশ আমাগোরই আছে। কোনওখানে যাওন লাগব না।

এই দোলাচলে গোটা পরিবারের বক্ষ দুরুদুরু। মধ্যবিত্ত পরিবার, চাষবাস আর শিক্ষকতা নিয়েই তাঁদের দিন-গুজরান, সম্পন্নতা বলতে কিছুই তেমন নেই। আমার দাদু ময়মনসিংহের সফল মোক্তার, তিনি কিছু টাকা পাঠাতেন দেশে, এই ভাবে চলছিল। দাদু তো দেশভাগের অনেক আগেই মারা গেছেন। বানিখাড়ার গ্রামের বাড়ি সুতরাং তখন টালমাটাল। কেননা দেশ ছেড়ে এলেও পশ্চিমবঙ্গে কোথায় আশ্রয় জুটবে তারও তো কিছু ঠিক নেই। এতগুলো মানুষের চলবেই বা কী করে?

রোজই বাড়ির পুরুষেরা একত্রিত হয়ে শুকনো মুখে নানা সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছুই হয় না। সব আলোচনাই অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। বাচ্চাদের মুখেও হাসি নেই। তারাও বুঝে গিয়েছিল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, আর সেটা মোটেই বাঞ্ছিত নয়।

ঠিক সেই অস্থির সময়ে এক দিন মধ্যরাতে বাড়িতে ডাকাত পড়ল। সেই সময়ে ডাকাতদের ছিল পোয়াবারো। সংকটের সময়ে হাওয়া বুঝে তারা লুটপাটের একেবারে মচ্ছব শুরু করেছিল। প্রতি রাতেই কোনও না কোনও বাড়িতে ডাকাত পড়তই। গাঁ ছেড়ে যারা চলে যাচ্ছিল, পথে তাদের ওপরেও হামলা হত।

তবু গাঁয়ের প্রাচীন বাসিন্দা আর সৎ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বলে পরিবারের কিছু সুনাম থাকায় ক্ষীণ বিশ্বাস ছিল যে ডাকাতরা হয়তো পণ্ডিতবাড়িকে রেয়াত করবে। করেনি।

মাঝরাতে ডাকাতের হুংকারে আর টর্চের আলোর ঝলকানিতে গোটা পরিবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ডাকাতরা বলছিল, যা আছে বাইর কইর্যা দে তাড়াতাড়ি, না হইলে কাইট্টা ফালামু। তাদের হাতে রাম দা, দা, সড়কি

আর লাঠি। মুখে কালিঝুলি মাখা থাকলেও তাদের অনেককেই চেনে আমাদের পরিবার।

ধনের চেয়ে প্রাণের মায়া অনেক বেশি। সুতরাং রব উঠল, প্রাণে মাইরোনা রে বাপ, যা আছে লইয়া যাও।

বাইর কর, বাইর কর যা আছে। সোনাদানা দে, টাকাপয়সা দে।

সেই সময়ে আমার নসুকাকুকে এক ডাকাত চুলের মুঠি ধরে কিছু দিয়ে মারতে উঠেছিল। বাড়ির সবচেয়ে নিরীহ, সবচেয়ে চুপচাপ, সাত চড়ে যার রা নেই সেই মিছরিপিসিমা হঠাৎ চৌকি থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে ডাকাতটাকে পাছড়ে ধরলেন, মারো ক্যান, অ্যাঁ! মারো ক্যান? ছাইরা দাও, আহ আমার লগে, দেখাইয়া দিতাছি কোনখানে কী আছে।

ডাকাতটা কাকুকে ছেড়ে দিয়ে বলল, চালাকি করলে কিন্তু এই দাও দেইখ্যা রাখ। দোফালা কইরা ফালামু।

মিছরিপিসিই অতঃপর ডাকাতদের গাইড। কোথায় কাঁসার বাসন, রুপোর গোট, কানের মাকড়ি আছে, কোথায় আছে লুকনো কাঁচা টাকা, সব দেখিয়ে দিতে লাগলেন। মুখে বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো শুধু বলে যাচ্ছিলেন, আমরা কি আর রাজা জমিদার? তবে প্রাণটুক লইয়া আছি রে বাবা। প্রাণটুক লইও না। আর সব লইয়া যাও।

উঠোন ঘিরে আলাদা আলাদা ঘর, বিচ্ছিন্ন। সব ঘরেই হানা দিল ডাকাতরা। সঙ্গে মিছরিপিসি। ঘরে ঢুকেই আগে মানুষজনকে আড়াল করে দাঁড়ান আর বলেন, মানুষগুলারে কিছু কইরোনা, তোমাগো পায়ে ধরি।

ডাকাতিতে দু-চারটে লাশ পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ভয় এবং আতঙ্ক সঞ্চার করতে হৃদয়হীন ডাকাতদের ওটা একটা কৌশলগত চাল। ভয় পেলে মানুষ আর ধনসম্পদের মায়া করে না, লুকনো জিনিসও বের করে দেয়।

কিন্তু নিরীহ, নীরব, ভিতু আর দুর্বল মিছরিপিসির জন্যই ডাকাতরা সে দিন রক্তপাত ঘটায়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লুটপাট সেরে তারা চলেও যায়।

ঘটনার পর মিছরিপিসিকে কেউ কেউ দোষারোপ করেছিল বটে, তুই ক্যান ডাকাইতগো সব দেখাইয়া দিলি?

কিন্তু পরবর্তী কালে সকলেই নিরীহ মিছরিপিসির ভূয়সী প্রশংসাই করত। বলত, মিছরির বড় সাহস, হ্যায় না থাকলে কী যে হইত কে জানে! মিছরিপিসি কিন্তু নির্বিকার, কোনও হেলদোল নেই।

এক অসহনীয় সৎ মানুষ

তিনি ছিলেন জার্ডিন মেনজিস-এর ওভারসিয়ার। তাঁর কাজের প্রকৃত ধরন আমার জানা নেই। তবে সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত। যত দূর জানি, সিভিল কনস্ট্রাকশন। সকালে কালীঘাটের বাসা থেকে ফুলপ্যান্ট, শার্ট, কোট আর মাথায় হ্যাট চাপিয়ে সাইকেলে বেরিয়ে পড়তেন। শুনতাম চাকরির সুবাদে তাঁকে সারা কলকাতা, টালা থেকে টালিগঞ্জ ঘুরে বেড়াতে হয়। রোগা, গৌরবর্ণ, ছোটখাটো মানুষ। ভুঁড়ো গোঁফ ছিল, চোখ দুটি ছিল ঈষৎ কটা। সারা জীবনে আমি তাঁর মতো মিতবাক, নম্রস্বভাব এবং আদ্যন্ত সৎ মানুষ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। যে কোম্পানিতে চাকরি করতেন, তার মালিকরা লালমুখো সাহেব। সাহেবদের অনেক গুণের মধ্যে একটা গুণ ছিল— অসাধারণ, সৎ বা কাজের মানুষকে তারা ঠিক চিনতে পারত। সুতরাং সেখানে আমার পিসেমশাই সুধন্যমোহনের চাকরি ছিল পাকা। শুধু পাকাই নয়, খুব আবছা শুনেছি, অফিসে তাঁর বিশেষ সমাদরও ছিল।

সুধন্যমোহন লেক মার্কেটে বাজার করতে যেতেন প্রতি দিন খুব সকালে। আমি তাঁর কাছেই প্রথম শিখি, বাজার কী করে করতে হয়। যা কিছু কিনতেন সবই বাজারের সেরা জিনিস। মর্তমান কলাটি যে আনতেন, তারও রূপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছোটই সংসার ছিল তাঁর, স্ত্রী আর দুই ছেলে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন আদ্যন্ত আত্মীয় ও অতিথিবৎসল। কোনও দিন তাঁদের সংসারে বাইরের লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, এমনটা বড় হত না। বিক্রমপুর বা ময়মনসিংহ থেকে যারা কাজে কলকাতা আসত, তারা সটান এসে সুধন্যমোহন আর সুমতির কাঁধে ভর দিত। সোজা কথায়, তাঁদের দাম্পত্যজীবন ছিল জনাকীর্ণ এবং হট্টমেলা। বৈঠকখানার বালাই নেই, একটার বেশি চেয়ারের জোগাড় নেই, তবু লোকে জলচৌকি, মোড়া, জানলার তাক— কোথাও না কোথাও ঠিকই জায়গা খুঁজে নিত। শুধু তো আশ্রয়স্থলই নয়, অনেক সময় চিকিৎসার জন্যও সুধন্যমোহনের বাড়িতে এসে উঠত তাঁর 'দ্যাশের' মানুষ। হোস্টেলে থাকাকালীন আমিও এক বার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পিসিমার কাছে চলে এসেছিলাম। কী যত্নে যে সেবা করেছিলেন তা বলার নয়।

কিন্তু সুধন্যমোহনকে আমি কোনও দিন এক জন গড়পড়তা মানুষ হিসেবে দেখিনি। সব সময়েই মনে হয়েছে, এই বিশুদ্ধ মানুষটি সাধারণ মানুষের এক লেভেল উঁচুতে। একটু শুচিবায়ু ছিল তাঁর, বড্ড পরিচ্ছন্ন

থাকতেন। কারও কাছ থেকে কখনও একটিও অনর্জিত পয়সা নিতেন না। কখনও মিথ্যে কথা বলেননি। কাউকে ঠকাননি কখনও। সোজা কথায়, এক জন অসহনীয় সৎ মানুষ।

অসহনীয় কথাটা বললাম এই কারণে যে, তাঁর ভালমানুষি দেখে আত্মীয়স্বজনরা বিরক্ত হতেন, বিশেষ করে আমার পিসিমা।

পিসেমশাই যখন রিটায়ার করেছেন তখনও কোম্পানি তাঁকে সহজে ছাড়তে চায়নি। কিছু দিন আটকে রেখেছিল, যদিও কোম্পানির সাহেবরা তখন ছিল না, দিশি অবাঙালি মালিক। এর পর পিসেমশাইকে বেশ বেশি টাকার বেতনে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির নির্মাণকার্যে কোনও কোম্পানি থেকে নিয়েছিল। গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি তখন সবে তৈরি হচ্ছে। নিরালা, নির্জন জায়গা। সেই বিশাল চত্বরে পিসেমশাই একখানা ঘরে একা থাকেন, নিজে রেঁধে খান।

গুয়াহাটির কাছে পাণ্ডু-র মালিগাঁওয়ে তখন আমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য দিদির কাছে গেছি। এক দিন পিসেমশাই এলেন। আমাকে দেখে কী একটা আনন্দের হাসি যে হাসলেন! বললেন, আমার বাসায় এক দিন আয়। দিন দুই বাদে বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে খুঁজতে খুঁজতে পিসেমশাইয়ের ডেরায় হাজির হয়েছি। চিন্তিত হয়ে বললাম, এত ফাঁকা, এত নির্জনে থাকেন কী কইরা? পিসেমশাই এক গাল হেসে বললেন, অসুবিধা হয় না।

শুনলাম, বাজার অনেকটা দূর। কাজের লোক না থাকায় বাসন-টাসন ওঁকেই মাজতে হয়। ওঁর এই নির্জনবাস দেখে আমি বেশ দুশ্চিন্তা করছিলাম। তবে পিসেমশাই তাঁর মতো বেশ গুছিয়েই আছেন দেখলাম। প্রাইমাস স্টোভ, কয়েকটা বাসন, ক্যাম্পখাটে সামান্য বিছানা, ব্যস। প্রসন্ন থাকতে তাঁর সামান্য বস্তুরই প্রয়োজন হত।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, তিনি পুরুষমানুষ হয়েও খবর রাখতেন যে আমি ক্ষীর খেতে ভালবাসি। ওখানে দুধ জোগাড় করা খুব মুশকিল। তাও পিসেমশাই দুধ জোগাড় করে এক বাটি ক্ষীর তৈরি করে রেখেছেন। সঙ্গে বোধহয় চিঁড়েভাজা-টাজা জাতীয় কিছু, এবং সম্ভবত কমলালেবুও। এত দিন বাদে খাবারগুলোর কথা বেশি মনে নেই। কিন্তু ওই অসামান্য মানুষটির অমলিন বাৎসল্যটি খুব মনে আছে।

সর্বদাই দেখতে পেতাম, কাছের মানুষ বা আত্মীয়রা তাঁকে তেমন গুরুত্ব দিত না বটে, কিন্তু বাইরের মানুষজনের কাছে তিনি সাধু-গুরুর সম্মান পেতেন। কাজের জায়গায় মিস্তিরিরা দেখেছি, তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। কারও সঙ্গে তাঁকে বিশেষ উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি কখনও। দুনিয়ায় তাই তাঁর শত্রু ছিল না।

পিসেমশাই এক বার আমাকে বলেছিলেন যে, দীর্ঘ কলকাতা বাসকালে তাঁর এক বার মাত্র পকেটমার হয়েছিল। পকেটমারকে তিনি চিনেওছিলেন, কিন্তু কিছু বলেননি, পাছে পাবলিক মেরে ওর হাড়গোড় ভেঙে

দেয়।

সাংঘাতিক সাইকেলবাজ

আজ কে জানে কেন সুকুমারের কথা মনে পড়ছে। সে ছিল কোচবিহার নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে আমার সহপাঠী। ক্লাস টেন, সেকশন বি। সকলের সঙ্গেই সকলের বেশ ভাবসাব ছিল। তবে ওই স্কুলে আমি ছিলাম নবাগত। কেউ আমার পুরনো বন্ধু নয়। তা হলেও ওই বয়সে মিলেমিশে যেতে তেমন দেরি হত না।

আমি বাল্যকালে ভীষণ দুষ্টু ছিলাম বটে, কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময়টাতেই বোধহয় আমার দুষ্টুমির পোকাগুলো ঘুমোতে গেল। যখন কোচবিহারে হোস্টেলে থেকে পড়ছি, তখন আমি অনেকটাই শান্ত স্বভাবের মানুষ। আমার ঠিক পিছনেই বসত সুকুমার। তার বেশ হাড়েমাসে চেহারা ছিল এবং মারকুট্টাও। কী কারণে জানি না, আমার সঙ্গে সুকুমারের এক-আধ বার ঝামেলা হয়েছে। প্রায় মারপিট লাগার মতো অবস্থা। কিন্তু আমি ঠিক আগের মতো মারমুখো ছিলাম না। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলি। মারপিট না হলেও মৃদু একটু শত্রুতা তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে আমার।

কিন্তু সুকুমারের যে আশ্চর্য গুণটা ছিল তা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। তার, যত দূর অনুমান, একটা মজবুত র‍্যালে সাইকেল ছিল। আর তাতে চড়ে সে এমন সব কাণ্ড করতে পারত যা সার্কাসের খেলুড়েরা দেখায়। সে অনায়াসে মাঠ থেকে সাইকেল চালিয়ে স্কুলের বারান্দায় তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপকে সাইকেল সমেত বারান্দায় উঠে পড়তে পারত। এ সব কাণ্ডের জন্য আলাদা মজবুত সাইকেল কিনতে পাওয়া যায় আজকাল। কিন্তু সুকুমারের সাইকেল ছিল নিতান্তই সাদামাটা। হয়তো একটু দামি, কিন্তু বিশেষত্ব কিছু নেই।

শুধু তা-ই নয়, সে সামনের চাকাটা একটু বাঁকিয়ে সাইকেলের সিটে বসা অবস্থাতেই সাইকেলকে একদম নিশ্চল করে রাখতে পারত। পাঁচ-সাত-দশ মিনিট বা ইচ্ছে করলে তারও বেশি। তখন দেখতাম তার মুখে চোখে একটা তীব্র টেনশন, অখণ্ড মনোযোগ।

আমি নিজে বিস্তর সাইকেল চালিয়েছি। লামডিং-এ টিলার ওপর আমাদের বাংলো ছিল। অনায়াসে সাইকেলে ওঠানামা করেছি। কিন্তু সাইকেলে এ রকম খেল কী করে দেখানো যায় তা আমার মাথায় আসত না।

আমি তখন ফুটবল ক্রিকেট খেলি। স্কুলে এই দুই খেলাতেই আমার কিছু সুনাম হয়েছিল। সকালে উঠে রীতিমত দৌড়তাম। দমও ছিল ভালই। সুকুমারের অন্য সব খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ ছিল না। শুধু সাইকেল

আর সাইকেল।

দীর্ঘ দিন আড়াআড়ির পর এক দিন ওই সাইকেলের কারণেই আমি তার সঙ্গে ভাব করে ফেললাম। বললাম, তুই কী করে ওটা করিস রে?

দূর, ও কিছু নয়। প্র্যাকটিস করলেই হয়।

আমাকে শিখিয়ে দিবি?

ও একটু ভেবেচিন্তে বলল, ব্যাপারটা কী জানিস! আমি কয়েক জনকে শিখিয়েছি, কিন্তু তারা পেরে ওঠেনি। সবাই বলে, এ আমাদের দ্বারা হবে না, তোর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।

তখন হোস্টেলে থাকি। আমার তো সেখানে সাইকেল ছিল না। সুকুমারই তার সাইকেলটা আমাকে এক দিন ধার দিল। স্কুলের মাঝখানে চমত্কার ঢালাও মাঠে আমি নানা ভাবে সাইকেল দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। দু-চার সেকেন্ডের বেশি হল না। সুকুমার হাসছিল। তার কাছে যা জলভাত, আমার কাছে তা-ই হিমালয়ে ওঠা। তার ওপর তার সাইকেলে সিঁড়ি ভাঙা তো অনেক দূরস্থান। সে এমন সুন্দর ধাপে ধাপে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে সাইকেলটাকে বারান্দায় তুলত, বহু বছর পরে বিদেশে ও-রকম করতে দেখেছি টিভিতে। তবে তা সাধারণ সাইকেল নয়, বিশেষ ভাবে তৈরি সাইকেল, যা সুকুমার চোখেও দেখেনি।

আমি হাল ছাড়লাম। ‘মন্ত্রশক্তি’ গল্পটা আমার পড়া ছিল। জানি, কিছু কিছু মানুষ কিছু কিছু জিনিস পারে, সবাই পারে না।

সাগর দীঘির পাড়ে সে বার একটা সাইকেল রেস হল। জেলাওয়াড়ি প্রতিযোগিতা। বিস্তর সাইকেলবাজ তাতে যোগ দিতে এল। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকেও এসেছিল শুনেছি। আর তাদের মধ্যে ছিল সুকুমারও। রেস শুরু হওয়ার পর পঞ্চাশ-ষাটটা সাইকেলের ভিড়ে সুকুমারকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠিক মনে নেই, দীঘির চারপাশে বোধহয় কুড়ি-পঁচিশটা বা পঞ্চাশটা রাউন্ড দিতে হবে। রাস্তা তেমন চওড়া নয় বলে সাইকেলে সাইকেলে বিস্তর ঠোকাঠুকিও হচ্ছিল। তবে লম্বা রেস, শেষ পর্যন্ত টেকা বেশ কঠিন।

আট-দশ রাউন্ডের পর দুটো-চারটে করে সাইকেলবাজ রেস থেকে সরে যাচ্ছিল। কারও চেন পড়ে গেছে, কারও চাকা পাংচার বা হ্যান্ডেল বেঁকে গেছে। বোধহয় কুড়ি রাউন্ডের পর জনা পনেরো টিকে ছিল এবং সবার শেষে সুকুমার। আমরা বেশ হতাশ হলাম। সুকুমার কি হেরে যাচ্ছে? আমরা চেঁচিয়ে তাকে নানা রকম উত্সাহ দিতে লাগলাম। সে অবশ্য ভ্রুক্ষেপ করল না। মাথাটা নিচু করে একমনে সাইকেল চালাতে লাগল।

শেষ পনেরো-ষোলো জনের মধ্যে যথেষ্ট ক্লান্তি দেখা যাচ্ছিল। সবাই ঘামছে, হাঁফাচ্ছে। রেস শেষ হওয়ার বোধহয় দুই কি তিন রাউন্ড যখন বাকি, তখন দেখলাম, সুকুমার খুব অনায়াসে এক জন এক জন করে

অগ্রবর্তীকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু তবু এক বা দুই নম্বর তখনও অনেক এগিয়ে। অতটা দূরত্ব পেরনো সম্ভব?

যখন সাইকেলগুলোই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে ঠিক তখনই সুকুমারের সাইকেলে একটা উন্মাদ গতি যেন ভর করল। হঠাত্ গতির ধাক্কায় ডাইনে-বাঁয়ে বিপজ্জনক টাল খেয়ে সুকুমার যেন সবাইকে প্রায় দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল সীমানার দিকে। এতগুলো রাউন্ডের পর ওই গতি কারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে দিন সুকুমারকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, মন্ত্রশক্তি গল্পটা মোটেই আজগুবি নয়।

বাহান্ন দিন টানা শিয়রে

আমার মামার সংখ্যা বড় কম নয়। মোট আট জন। মাসি পাঁচ। আমার মামার বাড়ির দিকটা, অর্থাৎ পুরো পরিবারটাই একটু ভালমানুষ, নির্বিরোধী, নিরীহ। কেউই তেমন লড়াকু বা ডাকাবুকো নয়। তা বলে সবাই সমান নিরীহ বা ভাল এমন নয়। কারও একটু-আধটু স্পিন আছে, বিপথে যাওয়াও আছে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। দাদামশাই ডাকসাইটে রেল-কর্মচারী ছিলেন। যেমন সুপুরুষ, তেমনই সাহসী ও সফল। মামারা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর চেহারাটা পেয়েছিলেন, চরিত্র নয়। ফলে দাদামশাই ষাট বছর হওয়ার আগেই যখন মারা যান, স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করার মতো যথেষ্ট সম্পত্তি রেখেই গিয়েছিলেন ছেলেদের জন্য, কিন্তু নিরীহ ও বিষয়বুদ্ধিহীন মামাদের সেই সম্পত্তি রক্ষা করার মতো এলেম ছিল না। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেল। তবু বলতে হবে ভালমানুষদের জন্য বোধহয় ভগবান কিছু ব্যবস্থা রাখেন। তাই ডুবতে ডুবতেও তাঁরা তেমন ভাবে তলিয়ে গেলেন না। সম্পন্নতা বা ঐশ্বর্য না থাকলেও মধ্যবিত্ততায় টিকে রইলেন। আমার মনে আছে, সেই ব্রিটিশ আমলে বগুড়া লোন ব্যাংকে দাদামশাইয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। দেশভাগের অনেক বছর পরে সেই ব্যাংক চিঠি দিয়ে সেই টাকা নিয়ে আসতে বলেছিল। কিন্তু পাকিস্তান যেতে হবে বলে ভয়ে কেউ সেই টাকা নিয়ে আসতে চায়নি। সুদে আসলে সেই টাকা তখন বেশ স্ফীত হয়েছে। আজও সেই টাকা বেওয়ারিশ পড়ে আছে।

আমার এই কাহিনি অবশ্য এক জনকে নিয়ে। তিনি আমার জিষ্ণুমামা। মাত্র দু-তিন মাস আগে বোধহয় নব্বই পেরনো মামা বিদায় নিলেন। যৌবনকালে জিষ্ণুমামার ছিল অসাধারণ চেহারা। খুব লম্বাচওড়া নন, কিন্তু টকটকে ফরসা, মাথায় কালো আঙুরের থোকার মতো কোঁকড়া চুল, তেমনই অসামান্য মুখশ্রী। দোষের মধ্যে একটু তোতলা ছিলেন।

আমরা তখন লামডিং-এ। রেলের যে বাড়িটিতে আমরা তখন থাকি, সেটি বেশ বড়। চারদিকে বাগান, পাশেই খেলার মাঠ। জিষ্ণুমামা তখন লামডিঙে বেড়াতে গেছেন। আর মামার সঙ্গে আমার খুব ভাব। আমার বন্ধুরাও তাঁকে ভারী পছন্দ করত। কারণ আমাদের কোনও আবদারই মামা ফেলতেন না। ক্রিকেটে ফিল্ডিং দিতেন, বল করতেন, গোলকিপিং করতেন, পেয়ারা বা কামরাঙা পেড়ে দিতেন।

সেই সময়ে এক দিন বিকেলে আমার শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এল। প্রবল জ্বর। এবং জ্বর লাফিয়ে লাফিয়ে একশো ছয় ডিগ্রিতে উঠে গেল সন্ধের পর। ডাক্তার এলেন। সব দেখেটেখে মুখ গম্ভীর করে বাবাকে

বললেন, ব্লাড টেস্ট করাতে হবে। মনে হচ্ছে টাইফয়েড। শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত। তখনকার দিনে টাইফয়েড হলে সহজে সারত না, দেড়-দু'মাসের ধাক্কা। আর সামনেই তখন আমার অ্যানুয়াল পরীক্ষা।

পরীক্ষার চিন্তায় প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে জ্বর পর দিনই এক সময়ে সাতানব্বইতে নামিয়ে ফেলেছিলাম। ডাক্তার দেখে বললেন, হ্যাঁ, উইল-পাওয়ারে এ রকম মাঝে মাঝে হয়, তবে এটা বেশি ক্ষণ থাকবে না। থাকলও না। জ্বর বাড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে পেট ছাড়ল। প্রবল জ্বর, প্রবল উদরাময়।

আর সেই সময়ে জিষ্ণুমামা আমার কাছে শয্যাপার্শ্বে সেই যে মোতায়েন হলেন, তাঁকে আর কেউ নড়াতেই পারল না। কী গভীর স্নেহ আর মমতায় জিষ্ণুমামা আমাকে আগলে ছিলেন তা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে। উনিই মাথা ধোয়াতেন, জলপট্টি দিতেন, ঘন ঘন বেডপ্যান পরিষ্কার করতেন। মা কাছে এলে বলতেন, মেজদি, তুমি কাছে এসো না, তা হলে বেশি বায়না করবে। তোমারও মন খারাপ হবে। দিদি বা ঠাকুমাকেও বেশি ঘেঁষতে দিতেন না। তখনকার দিনে জ্বর হলে পথ্যি ছিল বার্লি বা সাবু। খেতে পারতাম না। কিন্তু মামা ঠিক ভুলিয়েভালিয়ে, নানা রকম গল্প বলে, স্তোকবাক্য দিয়ে আমাকে খাইয়ে দিতেন। কখনও-সখনও এক-আধটা কমলালেবুর কোয়া, একখানা চোরাই বাতাসা বা চিনির জল আর লেবু ঘুষ দিতেন। রাত্রিবেলাতেও মামাই পাশে থাকতেন। প্রবল জ্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘোর লাগা চোখে চেয়ে দেখতাম, যিশুখ্রিস্টের মতো মামার করুণ মুখ আর মায়াভরা দুটি চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। আমার প্রাণপাখিটিকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা দিতেন জিষ্ণুমামা।

আমার মাথার কাছে একটা রেডিয়ো ছিল। সন্ধেবেলা মামা রেডিয়ো চালিয়ে আমাকে শোনাতেন।

বাহান্ন দিন বড় কম সময় নয়। তখন টাইফয়েডের কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ ছিল না, জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ছিল না, এখনকার মতো ডাক্তাররা তখন ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবারের পথ্য দিতেন না। ফলে শরীর শুকিয়ে কাঠি হতে লাগল, শরীরের সব শক্তি উধাও হল আর নেমে এল রাজ্যের দুর্বলতা। বালিশ থেকে ঘাড়ই তুলতে পারি না। জিষ্ণুমামা তখন উঁচু করে বালিশ সাজিয়ে, আমাকে পাঁজাকোলে করে বসিয়ে দিতেন। কত গল্প বলতেন, কত ভরসা দিতেন। কী যত্নে যে অয়েল ক্লথ পেতে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে দিতেন তা বলার নয়।

একটু একটু করে জ্বর নামল। বোধহয় মাসখানেকের মাথায় আমাকে গরম জলে কিছু ক্ষণ রাখা ডিম প্রায় তরল অবস্থায় খাওয়ার নির্দেশ দিলেন ডাক্তার। সে যেন অমৃত। মুড়ি খাওয়ার অনুমতিও পাওয়া গেল, কিন্তু বেশি নয়, কম। আমি তখন কেবল খাবারের বায়না করতাম, কাঁদতামও। কিন্তু সর্বংসহ জিষ্ণুমামা আমাকে ঠিক সামলাতেন। ওষুধ, পথ্য সব তিনিই খাওয়াতেন। বড় কৌটোর ভিতরে আগে কাগজ ঢুকিয়ে পরিসর কমিয়ে ওপরে মুড়ি ঢেলে আমাকে দিতেন, যাতে বেশি না খাই।

তখন জিষ্ণুমামাকে যতটা না বুঝেছি, পরে বড় হয়ে বুঝেছি তার ঢের বেশি। আজও মনে হয়, জিষ্ণুমামার ভিতরে বাহান্ন দিন ধরে স্বয়ং ভগবান আমাকে আগলে রেখেছিলেন। আজও তাঁর জন্য বুক টনটন করে।

খালি হাতে বাঘ মেরেছিলেন

বীরদের কথা পুঁথিপত্রে পড়েছি বটে, কিন্তু বাস্তবে বড় একটা দেখিনি। এখন বীরদের জায়গা নিয়েছে গুন্ডা-মস্তানরা, দেখে বড়ই হতাশ হতে হয়। তবু ভাগ্য ভাল যে, জীবনে অন্তত এক জন বীরোচিত মানুষকে দেখেছিলাম।

তখন আমার বয়স নয় বা দশ হবে। বাবা দোমোহানিতে বদলি হয়ে এসেছেন। সে একটা ভারী পরিচ্ছন্ন রেল শহর। রেলের বড় বড় অফিসারদের বাস। অন্য ধারে একটা গঞ্জ শহরও আছে বটে। রেল কলোনির রাস্তাঘাট ভারী ভাল। বিস্তর লিচুগাছ এবং শহরের উপকণ্ঠে বাঘের জঙ্গল। বাঘের উৎপাতও খুব। দোমোহানির কাছেই বীণাগুড়ি চা-বাগানে আমার সেজো মামা চাকরি করতেন। মাঝে মাঝে যেতাম। এক দিন যেতেই মামি বললেন, জানিস কাল কী হয়েছে? রান্নাঘরে রাঁধছিলুম, কুকুরটা দরজার বাইরে বসে ছিল। হঠাৎ ঘ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে দেখি, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে, আর বাঘের পায়ের ছাপ!

রেল কোয়ার্টারে আমাদের প্রায় প্রতিবেশীই ছিলেন শওকত আলী। ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ, সুদর্শন। বিয়ে করেননি, একা থাকতেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন ডিটিএস অফিসের কেরানি। তাঁর কোয়ার্টারে ঢুকলে গা ছমছম করত। ঘরের দরজা-জানলা বেশির ভাগই বন্ধ, অন্ধকার, আর সেই ঘরে মানুষের করোটি, হাড় এবং নানাবিধ অদ্ভুত সরঞ্জাম ছিল। শুনেছি, তিনি গোপনে কিছু সাধনা-টাধনাও করতেন। ছিলেন অঘোষিত এক জন ম্যাজিশিয়ান। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিমন্যাস্টিক্স, এ-সব ছিল তাঁর সহজাত বিদ্যা। আর ওই এলাকায় তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল খালি হাতে বাঘ মারার জন্য। উনি সত্যিই খালি হাতে একটা চিতাবাঘকে গলা টিপে মেরেছিলেন। দোমোহানির আউটার সিগনালের কাছে বাঘের উৎপাত হচ্ছে জেনে রেলের সাহেবসুবো অফিসাররা বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে উনিও। ওঁর বন্দুক ছিল না, গিয়েছিলেন একটা লাঠি নিয়ে। বিটাররা যখন ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘকে তাড়িয়ে আনার চেষ্টা করছিল, তখন দুর্ভাগ্যবশত বাঘটা চড়াও হয়েছিল শওকতের ওপরেই। উনি আমাকে বলেছিলেন, 'জানিস, বাঘটা তেমন বড়সড় ছিল না, বড়জোর একটা ডালকুত্তার সাইজের। আমি ভেবেছিলাম লাঠির ঘায়েই ঘায়েল করতে পারব। কিন্তু বাঘ যে কত ফাস্ট হয়, জানতাম না। আমি লাঠি তোলবার আগেই বিদ্যুতের গতিতে একটা থাবা মেরে লাঠিটা ছিটকে দিল। আমাকে নড়বারও সময় না দিয়ে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

শওকত আলীর বুকে, পেটে, হাতে বাঘের আঁচড়ের গভীর দাগ দেখেছি। পিঠ তো ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষটার সাহস আর রোখ ছিল অসাধারণ। বাঘের সঙ্গে যুঝে বিপুল রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও শেষ অবধি তার গলা টিপে মেরেছিলেন। তাঁর বাঁচার আশা ছিল না। কিন্তু সাহেবসুবোরা এ রকম এক জন সাহসী মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিলেন। মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে, নইলে সেপটিক হয়েই মারা যেতেন। এর পরেও বাঘশিকারীদের সঙ্গী তিনি বহু বার হয়েছেন।

দোমোহানিতে জিম ছিল না। কিন্তু শওকত আলী অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পিছন দিকে সমারসল্ট খেতে পারতেন। আমাদের লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শেখাতেন। বলতেন, ‘বুঝলি, যত ফাস্ট হবি তত অ্যাডভান্টেজ। ফাস্ট, ফাস্টার, ফাস্টেস্ট। দ্রুত গতিই হল আসল শক্তি। বাঘের কাছে আমি ওইটে শিখেছি।’

কোনও বিপদেই ওঁকে কখনও ভয় পেতে দেখিনি। সে বার জলপাইগুড়ি জেল থেকে ভয়ংকর এক খুনি আসামি পালিয়ে এসে দোমোহানি স্টেশনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। বিশাল চেহারা এবং প্রচণ্ড মারমুখো একটা লোক। নির্জন স্টেশনে তার সন্দেহজনক অবস্থান নিয়ে কয়েক জন কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, লোকটা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে জনা দুয়েককে ছোরার ঘায়ে জখম করে পালাতে থাকে। ছোট্ট জায়গা, খবর রটতে দেরি হয়নি। ভয় পেয়ে গেরস্তরা সব ঘরে গিয়ে দোর দিয়েছিল। খুনিটা রাত করে রেললাইন ধরে হাঁটছিল। যেখানে অ্যাডভেঞ্চার, সেখানেই শওকত আলী। তিনি একা লোকটার পিছু নেন এবং দ্রুত গিয়ে তার সঙ্গ ধরে খুব ভালমানুষের মতো একটা বিড়ি চান। লোকটা তৎক্ষণাৎ ছোরা বের করে ‘বিড়ি লেগা?’ বলে চড়াও হয়। আড়ে বহরে অনেক ছোট শওকত আলী কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে সোজা ডাইভ দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে এক ঝটকায় ফেলে দেন। জুডো জিনিসটা কী, তা আমরা তখনও জানিই না। শওকত জানতেন। ওই বিশাল লোকটাকে কাবু করে তিনি তার কবজি ধরে স্টেশনে নিয়ে আসেন। কবজিটা ধরেছিলেন যে কায়দায়, তাকে নাকি বলে জুডো’স থাম্ব লক। সেটা এমন কায়দা যে, হাত ছাড়াতে গেলে নাকি কবজিটা মট করে ভেঙে যাবে।

সে বার এক বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান দোমোহানিতে এসে ম্যাজিক দেখিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য সব ম্যাজিক। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পর দিন সেই ম্যাজিশিয়ানের উপস্থিতিতেই শওকত আলী একই স্টেজে সেই সব ম্যাজিক আরও সুন্দর ভাবে দেখালেন। সঙ্গে অনেক নতুন ম্যাজিকও। কিন্তু একটিও পয়সা নিলেন না, বললেন, গুরুর বারণ।

এই আশ্চর্য লোকটির কাছে আমার অনেক কিছু শেখার ছিল। কিন্তু কপাল, বাবা বদলি হয়ে গেলেন। আমরাও চলে গেলাম পূর্ব বঙ্গে। এর কয়েক বছর পর দেশ ভাগ হয়ে গেল। আর দেখা হল না কোনও দিন।

এ তো আচিমিৎকার জিনিস!

সাত বছর বয়সে বিয়ে। চোদ্দো বছর বয়সে বিধবা। কিন্তু বিবাহিত সাত বছরের জীবনেও তাঁর স্বামী-সংসর্গ হয়নি। কারণ পণ নিয়ে কী একটা গোলমালে শ্বশুরবাড়ি তাঁকে নেয়নি। আমার ঠাকুরদার বাবা কালীকুমারও জেদি আর একরোখা মানুষ ছিলেন। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অন্যায় দাবিদাওয়ার কাছে মাথা নোয়াননি। কিন্তু এর ফলে আমার সম্পর্কিত এই ঠাকুমার জীবনটাই বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। যেমন টকটকে ফরসা রং, দীঘল চোখ, টিকোলো নাক, তেমনই মুখের আশ্চর্য ডৌল। বুড়ো বয়সেও তাঁর রূপের স্মৃতিচিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেত।

চোদ্দো বছর বয়সে বিধবা সরোজিনী বাপের বাড়ির গলগ্রহ বিশেষ। তবে যৌথ পরিবারে তেমন অসুবিধে হয় না। মিলেমিশে আদরে-অনাদরে জীবন কেটে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাটাতনে উঠতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর হাত আর পা ভাঙে। বিক্রমপুরের বাইনখাড়া গ্রামে আর হাড়ের ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে? কোনও এক হাতুড়ে এসেই ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমার হাত-পা জোড়া লাগে বটে, তবে বাঁকা হয়ে। হাত বাঁকা, পা বাঁকা। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত। সেই থেকে ভাইপো-ভাইঝিরা বেঁকি পিসি বলে ডাকত।

ময়মনসিংহে আমার দাদু, অর্থাৎ তাঁর ধনভাইয়ের বাড়িতে যখন মাঝে মাঝে আসতেন, তখন তিনি প্রৌঢ়া। কিন্তু এত রূপ যে, ঘর যেন আলো হয়ে যেত। এমন রূপসির ঘর হল না, বর হল না। এটা যে কত দুঃখের তা আমরা সেই শিশুকালেও বুঝতাম। কিন্তু সরোজিনী ঠাকুমার তাপ-উত্তাপ ছিল না।

বরের কথা কি একটুও মনে আছে তাঁর? প্রশ্ন করলে খুব হাসতেন। বলতেন, মুখটাই তো দেখি নাই, মনে থাকবো ক্যামনে?

ক্যান, দেখ নাই ক্যান?

দেখুম ক্যামনে রে পোড়াকপাইল্যা? শুভদৃষ্টির সময়ে তো ঘুমে ঢুলতাছি। কী সব হইতাছিল চাইরদিকে কিছুই বুঝি নাই। মাইনসে কইল আমার নাকি বিয়া হইয়া গেছে।

দেশভাগ না হলে সরোজিনীর বাকি জীবনটা সুখে-দুঃখে কেটে যেত। কিন্তু দেশভাগ হওয়ার ফলে যৌথ পরিবার থেকে যে যার মতো ছিটকে গেল বিভিন্ন জায়গায়। অনাথা বিধবা সরোজিনী পড়লেন আতান্তরে। তাঁর আপনজন সেই অর্থে কেউ নেই। তাই কিছু দিন কলকাতায়, কিছু দিন অসমে এবং অন্যত্র

আত্মীয়স্বজনদের কাছে থাকলেন। কিন্তু সকলেরই অসুবিধে। আচমকা দেশভাগের ফলে কারও অবস্থা ভাল নয়। শেষ অবধি তাঁর দুর্দশার খবর পেয়ে আমার মা আর বাবা ঠিক করলেন, তাঁকে আমাদের বাড়িতেই এনে পাকাপাকি ভাবে রাখবেন।

সেই থেকে তিনি আমাদের কাছে। ঠাকুমা তাঁকে ঠাকুরঝি বলে ডাকতেন। সেই জন্য আমরা ভাইবোনরা সবাই ডাকতাম ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আর ঠাকুমা পাশাপাশি দুটো চৌকিতে শুতেন। অনেক রাত অবধি তাঁরা গল্প করতেন। বেশির ভাগই পুরনো আমলের কথা, নানা স্মৃতিচারণ। তার মধ্যেই দুজনে ঝগড়াও লেগে যেত। ঝগড়া অবশ্য একতরফা। ঠাকুমা বকুনি দিতেন, ঠাকুরঝি চুপ করে থাকতেন। এক দিন দুজনের মধ্যে ভারী মজার ঝগড়া লেগেছিল। বাড়ির বাথরুমটা ছিল দূরে, উঠোনের অন্য প্রান্তে। খুব ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে উঠে ঠাকুরঝি বাথরুমে যেতে গিয়ে সামনে সাদা একটা মূর্তি দেখে 'রাম রাম' করতে করতে কেঁপে ঝেঁপে সেই মূর্তিটাকেই টাল সামলাতে আঁকড়ে ধরেন। আসলে তখন ঠাকুমাই বাথরুম থেকে ফিরছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে ঠাকুরঝি বলে ওঠেন, দুর্গা দুর্গা, আপনে নাকি? ঠাকুমা তখন রেগে গিয়ে বললেন, ক্যান, আপনি কারে ভাবছিলেন? ঠাকুরঝি বললেন, আমি তো ভাবলাম ভূত বুঝি! ঠাকুমা খেপে গিয়ে বললেন, আপনের আক্কলটা কী কন তো? ভূতই যদি ভাবলেন তবে তারে সাপটাইয়া ধরলেন ক্যান? এই নিয়ে পরে তুমুল হাসাহাসি।

এক দিন আমাকে ডেকে ঠাকুরঝি বললেন, রুণু রে, আমার চুলগুলি বড় হইছে, একটা নাপিত ডাইক্যা কাটাইয়া দিবি? আমি বললাম, নাপিতে কী দরকার? আমিই দিমু অনে কাইট্যা। মায়ের ভারী কাঁচি আর বড় চিরুনি নিয়ে, ঠাকুরঝিকে খবরের কাগজের জামা পরিয়ে আমি চুল কাটতে লেগে গেলাম। শেষ অবধি কদমছাঁট হল বটে, কিন্তু মাথাটা বড্ড এবড়োখেবড়ো দেখাতে লাগল। হাত-আয়নায় নিজের চুলের দুর্দশা দেখে ঠাকুরঝি আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ! এইটা করছস কী? মাথাটারে তো নাশ করলি রে হারামজাদা! আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এই হেয়ারস্টাইলটা নতুন। কিন্তু যে দেখে, সেই হাসে। মা আমাকে খুব বকল, পিসিমার অমন সুন্দর চেহারাটার কী ছিরি করেছিস বল তো!

বিধবারা চানাচুর বা দোকানের শিঙাড়া, কচুরি খায় কি না, এ বিষয়ে শুদ্ধাচারী বিধবাদের অনেক সংশয় ছিল। প্রথম প্রথম ও-সব জিনিস খাওয়ার কথায় আঁতকে উঠতেন। পরে মা জোর করে খাওয়াত। ঠাকুরঝি প্রথমে চানাচুর খেয়ে সোল্লাসে বলে উঠেছিলেন, কী জিনিস খাওয়াইলা গো গায়ত্রী, এ তো আচিমিৎকার জিনিস। আচিমিৎকার মানে হল অতি চমৎকার। আর এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে শিঙাড়া, কচুরি ইত্যাদি এবং পোলাওটোলাও খেয়েছেন। মাঝেমধ্যে বলতেন, দ্যাশের বাড়িতে থাকতে খাইতে খাইছি খেসারির ডাইল

আর যত কচু-ঘেচু। এই তোমার কাছে আইয়াই জীবনে প্রথম ভালমন্দ খাইতাছি। তুমি বাইচ্যা থাকো গো বউ, অনেক দিন।

যখন আমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন, তখন তাঁর কাঠিসার চেহারা, মুখে চোখে দুশ্চিন্তা, ভয়, উদ্ভ্রান্তি। মায়ের যত্নআত্তি আর মিষ্টি কথার ফলে ধীরে ধীরে তাঁর দুশ্চিন্তা কেটে গেল। গায়ে কিছু লাবণ্যের সঞ্চার ঘটল। মুখে এল রক্তাভা। আশ্চর্য এই, অদেখা অজানা এক পুরুষের জন্য সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করার কষ্টের জন্য তিনি কখনও দুঃখ করতেন না।

আনন্দই ছিল তাঁর ঈশ্বর

আমাদের বাড়িতে সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, হঠযোগী, গায়ক, বাদক, ভবঘুরে, ফকির-দরবেশের আনাগোনার বিরাম ছিল না। এঁদের অনেককেই পাত পেড়ে খাওয়ানো তো হতই, কেউ কেউ দু-চার দিন থেকেও যেতেন। মা বিশেষ রাগটাগও করতেন না। কারণ মায়ের প্রাথমিক শিক্ষাটা হয়েছিল সারদেশ্বরী আশ্রমে। বাবা ব্রিটিশ আমলের রেলের অফিসার হওয়ার সুবাদে রীতিমত স্যুটেড-বুটেড সাহেবসুবো ছিলেন বটে, কিন্তু কালীঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম না করে বেরোতেন না। আর ছিলেন বড়ই অতিথিবৎসল এবং উদার। সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশদের তিনিই যেচে নিয়ে আসতেন বাড়িতে।

তখন আমরা কাটিহারে। বাংলোটি বড়সড়। চার দিকে অনেকটা ঘেরা কম্পাউন্ড। যে অভিজাত রেলপাড়ায় আমরা থাকতাম, তার নামই ছিল সাহেবপাড়া। কারণ বেশির ভাগ বাংলোতেই থাকতেন রেলের উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার। ক্রিসমাস বা নিউ ইয়ারে সেই সব বাড়ি থেকে পেল্লায় ঝুড়িতে ভেট আসত। রকমারি জিনিস থাকত, সঙ্গে মদের বোতল এবং জ্যান্ত মুরগিও। মা হেঁশেলে মুরগি ঢুকতে দিতেন না। মুরগি রান্না করত বাবার সেলুন কারের খানসামা পাঁচু শেখ।

এক দিন সন্ধেবেলা পূর্ণিয়া থেকে বাবা অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে নিয়ে এলেন দাতাবাবাকে। পেল্লায় ভুঁড়িদার চেহারা, মাথায় ঘন জঙ্গলের মতো ঘেঁষ চুল, মুখময় কালো দাড়িগোঁফ, পরনে রক্তাম্বর, গলায় বেশ কয়েকটা পাথরের মালাও ছিল। মুসলমান ফকির ছিলেন তিনি। অতি সুগন্ধী দামি জরদা দিয়ে ঘন ঘন পান খেতেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা। আর সে কী প্রাণখোলা হাসি! হাসির দাপটে বাড়ি কেঁপে উঠত। কথায় কথায় হাসতেন। তিনি এলেই আমাদের বাড়িটার সব বিষাদ যেন উড়ে পালাত।

আমাদের পরিবারে কঠোর অনুশাসন ছিল, অব্রাহ্মণকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা চলবে না। সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশদের বেলায় কিন্তু মা-বাবা ব্যতিক্রম করতেন। দাতাবাবাকে আমরা পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতাম।

দাতাবাবা বাড়িতে এলেই পাঁচু শেখের ডাক পড়ত। সে বাজার থেকে মুরগি কিনে তার বাড়িতেই রান্না করে নিয়ে আসত। শুনেছি, সে নাকি অসাধারণ রাঁধুনি ছিল। তবে আমি, দিদি আর মা ও সব খেতাম না। দাতাবাবার আবার মুরগি না হলেই নয়। খেতেও পারতেন বটে। আর কী তৃপ্তি করেই যে খেতেন! মুখে-চোখে সেই আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠত।

তখন কাটিহার, পূর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুরে দাতাবাবার খুব নামডাক। মস্ত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ফকির বলে তাঁর প্রবল খ্যাতি। লোকের মুখে মুখে ফিরত, দাতাবাবা পূর্ণিয়ার রাজাকে এক ভয়ংকর বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ঘটনাটা আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। পূর্ণিয়ার রাজা বোধহয় একটা খুনের মামলার আসামি সাব্যস্ত হয়েছিলেন বা ও রকমই কিছু। এবং সেই মামলায় তাঁর গুরুতর সাজা হওয়ার কথা। দাতাবাবা কী করে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই ইতিবৃত্তান্তও জানি না। তবে সেই ঘটনার পর দাতাবাবার মস্ত ভক্ত হয়ে পড়েন পূর্ণিয়ার রাজা।

প্রথম প্রথম দাতাবাবা বাড়িতে এলে আমি একটু সিঁটিয়ে থাকতাম ভয়ে। কিন্তু আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে অনেক গল্প করতেন। উনি কিন্তু কখনওই নিজের মুখে তাঁর কোনও মহিমা বা কৃতিত্বের কথা বলতেন না। লোকে বললেও বিরক্ত হতেন। নিজেকে সাধুসন্ত বলে দাবিও করতেন না। অথচ অনেকের মুখেই শুনতাম ওঁর মহিমায় তাদের রোগ সেরেছে, সংকট কেটেছে, বিপদ দূর হয়েছে। আমার আবছা মনে পড়ে, মায়ের সোনার গয়না হারিয়ে গিয়েছিল। দাতাবাবাকে সেটা জানানোয় তিনি বিশেষ একটা জায়গায় খুঁজে দেখতে বলেছিলেন এবং সেখানেই সেটা পাওয়াও যায়।

দাতাবাবা পয়সাকড়ি নিতেন না। তাঁকে শুধু ভাল রান্না আর জরদা-পান নিবেদন করলেই খুশি। সেই খুশিটাই ছিল বিস্ফোরণের মতো। এমন অট্টহাসি হাসতেন যে, সেটা এখনও যেন সময়ের সরণি পেরিয়ে এসে আমার শ্রবণে হানা দেয়। আনন্দময় পুরুষ আর কাকে বলে!

হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো একটা খবর এল। দাতাবাবাকে চিটিং কেসে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং ফাটকে পুরেছে। শুনে সকলেই মুষড়ে পড়েছিল। আমিও। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল দাতাবাবা কাউকে ঠকাতেই পারেন না। সম্ভবত একটা সম্পদঘটিত মামলা ছিল সেটা। কেউ এক জন দাতাবাবাকে সম্পত্তি দান করে এবং কোনও শত্রুপক্ষ তাই নিয়ে চিটিং কেস করে বসে। পূর্ণিয়ার রাজা ভাল উকিল লাগিয়ে দাতাবাবাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ও দিকে শোনা যায়, থানায় তাঁর ওপর পুলিশ যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে।

তবে কিছু দিনের মধ্যেই দাতাবাবা ছাড়া পেয়ে যান। এবং তারও কিছু পরে আমাদের কাটিহারের বাসাতেও আসেন। আশ্চর্য এই, কোনও পরিবর্তনই হয়নি তাঁর। সেই হাসি, সেই তৃপ্তি করে খাওয়াদাওয়া, তেমনই জমিয়ে গল্প করা, কিন্তু কখনও তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তাঁর সঙ্গে যারা শত্রুতা করেছিল তাদের কোনও রকম নিন্দেমন্দ করেননি। জিজ্ঞেস করলে খুব হাসতে হাসতে বলতেন, কপালে একটু হাজতবাস ছিল আর কী! এর বেশি কিছু নয়। দেখা গেল তাঁর আনন্দময় সত্তা থেকে কিছুই কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। ধর্মকথা বলতেন না। উপদেশ দিতেন না। বোধহয় শুধু নিজের অফুরান আনন্দই ছিল তাঁর প্রকৃত ঈশ্বর।

‘বুঝলা, হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেতাজি’

অসম থেকে বাবা যখন শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এলেন, তখন শিলিগুড়ি এখনকার মতো ফাঁদালো শহর হয়ে ওঠেনি। মফস্সলের গন্ধ তার অঙ্গে অঙ্গে। পুরনো বাজার, ভাল দোকানপাট নেই, রাস্তা ভাল নয়। হংকং মার্কেট বা নিউ মার্কেট তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। দুর্দশাগ্রস্ত হাসপাতাল। তিন ফুটের দোকান একটা-দুটো, ডাক্তারবদ্যি বলতে দু-চার জন। তবে হ্যাঁ, বেশ শান্তির জায়গা। প্রমোদ বলতে একটামাত্র সিনেমা হল, ছেলেদের আর মেয়েদের একটা করে স্কুল। ইংলিশ মিডিয়ম তখনও ছিল না শহরে। তবে এ কথাও সত্যি যে, তখন আমরা এ সব অভাব টের পেতাম না। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

তখন রেডিমেড পোশাকের যুগ নয়। শার্ট-প্যান্টের কাপড় কিনে দরজিকে দিয়ে বানিয়ে নিতে হত। বাবা সাহেব আমলের রেলের অফিসার। ফলে শার্ট, প্যান্ট, কোট বা স্যুট নিয়ে তাঁর ছিল প্রবল খুঁতখুঁতুনি। কত দরজিকে যে মারতে উঠেছেন, তার হিসেব নেই। তবু কাটিহার এবং অন্য সব বড় জায়গায় এক-আধ জন ভাল দরজি পাওয়া যেত। শিলিগুড়িতে তা-ও ছিল না। কিন্তু পুজো-পার্বণে দরজি ছাড়া চলবেই বা কেমন করে! আমাদের দুই ভাইয়ের তেমন ঝামেলা নেই, কারণ ফিটিং নিয়ে আমাদের বক্তব্য তখনও তৈরি হয়নি। মুশকিল বাবাকে নিয়ে। যে দু-চার জন দরজিকে ট্রায়াল দিয়েছেন, তারা মোটেই সুবিধের নয়।

রেলের কোনও লোকই বোধহয় বাবাকে খবর দিয়েছিলেন যে, পুরনো বাজারের শেষের মাথায় একটা ছোট্ট দরজির দোকান আছে। অজিত বিশ্বাস হল সেই দোকানের মালিক। ভাল কাটার।

সেই অজিতকে এক দিন পাকড়াও করে আনা হল। বেশ হাসিখুশি মুখ, শ্যামবর্ণ। আমাদের বাড়িতে পা দিয়ে অবধি যে সে কথা শুরু করল, যত ক্ষণ ছিল শুধু বকবক করে গেল। আর সেই বকবকানির মূল বিষয় হল, এ শহরে তার মতো দরজি আর নেই। বাকি সব দরজিরা নিতান্তই আনাড়ি, কেউ কাজ জানে না ইত্যাদি। নিজের বাড়ির খবর, পূর্ববঙ্গের দেশের খবর, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, নেহরু, গাঁধী কিছুই বাদ ছিল না। বকবক বকবক। বাড়িসুদ্ধু তার কথার তোড়ে তিতিবিরক্ত হয়ে গেল। ওরই ফাঁকে ফাঁকে সে চা-বিস্কুট খেল এবং গজ-ফিতে দিয়ে বাবার আর আমাদের শার্ট-প্যান্টের মাপও নিয়ে নিল। সে বিদায় হওয়ার পর বাবা খুব হতাশ হয়ে বললেন, এই বাচালটারে দিয়া কি কাম হইব? আমাদেরও মনে হয়েছিল এ রকম বকবকবাজকে দিয়ে কাজ হবে না।

পরে বেরল তার আর এক গুণের কথা। তারই দেওয়া তারিখ পার করেও সে জামাপ্যান্ট দিয়ে উঠতে পারল না। এবং ক্রমেই ডেট পিছোতে লাগল।

ধমক-চমক করলেও সে অবশ্য রাগ করত না। সেই হাসিমুখেই নানা অজুহাত বানাত।

কিন্তু শেষ অবধি যখন সত্যিই জামাপ্যান্ট ডেলিভারি দিল, বাবা পর্যন্ত চুপ। কোনও খুঁত নেই। সামনাসামনি বাবা অবশ্য তেমন প্রশংসা করলেন না। কিন্তু সে বিদায় হওয়ার পর বললেন, হারামজাদার কথার তোড়ে মাথা ধইরা যায় ঠিকই, কিন্তু কাম করে বড় জব্বর।

অজিত বিশ্বাসকে আবিষ্কার করে বাবা খুশি হলেন। এর পর থেকে অজিতই আমাদের বাঁধা দরজি হয়ে গেল। যত বার তার দোকানে তাগাদা দিতে গিয়েছি, তত বারই রাজনীতি নিয়ে তার ভাষণ শুনতে হয়েছে। ননস্টপ। একটা মানুষ কাজ করতে করতে, সেলাই মেশিন চালাতে চালাতে বা মাপমত প্যান্ট শার্টের কাপড় কাটতে কাটতে কী করে যে এত কথা বলতে পারে, সেটাই বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজে ভুলচুক ছিল না। লোকে তাকে বলত মাস্টার কাটার।

এক দিন গিয়ে দেখি অজিতদা নেই। তার কর্মচারী বলল, উনি তো শৌলমারি গেছেন। নেতাজিকে দেখতে।

সেই যে শৌলমারি তার মাথায় ঢুকল, তার পর তার সব কথাই শৌলমারির সাধুকে নিয়ে। তিনিই যে নেতাজি, এ বিষয়ে তার তিলেক সন্দেহ ছিল না। আমাকে বোঝাত, বুঝলা রুনু, নাইনটিন থার্টিফোরে আমি নেতাজিরে দেখছিলাম বইলাই শৌলমারির সাধুরে চিনতে আমার দেরি হয় নাই। হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেতাজি।

আমরা জানি, তৎকালের বাঙালি এবং বিশেষ করে উদ্বাস্তুরা রাজনীতির কূটকচালিতে, দেশভাগজনিত সমস্যায় কণ্টকিত হয়ে তিতিবিরক্ত মনে যে উজ্জ্বল উদ্ধারের স্বপ্ন দেখত, তার নায়ক ছিলেন নেতাজি। নিরুদ্দিষ্ট নেতাজি এক দিন ফিরে এসে দেশের হাল ধরবেন এবং ভারতবর্ষ পালটে যাবে— এই আশা অনেকের বড় বলবতী ছিল। আমারও তো কত দিন মনে হয়েছে, ওই দুঃসাহসী, সর্বত্যাগী মহান মানুষটি ফিরে এলে বড় ভাল হয়।

কিন্তু অজিতের দৃঢ় বিশ্বাস, নেতাজি এসেই গেছেন, আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। সাধুর নির্মোক ছেড়ে তিনি স্বমূর্তি ধরবেনই। আর সেই দুর্মর আশায় সে প্রায় নিত্যই শৌলমারি যেত। সাধুর কাছাকাছি যাওয়ার উপায় ছিল না। দূর থেকে দেখতে হত, যখন তিনি খুব সামান্য ক্ষণের জন্য বাইরে পায়চারি করতে বেরতেন। ওই দর্শনটুকুই অজিতের পক্ষে যথেষ্ট। রোজগারের সব টাকাই প্রায় নেতাজির ফান্ডে জমা দিতে শুরু করল।

কিন্তু আমাদেরই হল মুশকিল। কারণ অজিতের ব্যবসা তখন প্রায় লাটে উঠেছে। সে আর কাটিং করে না। ব্যবসাতে মন নেই। শিলিগুড়ি ছেড়ে শৌলমারি তখন তার লক্ষ্যবস্তু। ফলে তখন আমাদের অন্যান্য দরজির শরণাপন্ন হতে হল। কিন্তু তারা কেউ অজিতের মতো মাস্টার কাটার নয়।

কী ভাবে তার মোহভঙ্গ হয়েছিল, জানি না। তবে কয়েক বছর লেগেছিল। বিস্তর টাকা ব্যয় হয়েছে। পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ। অজিত তখন ফিরে এল। একটু বিষণ্ণ, একটু হতাশ। কথাও কমে গেছে অনেক। কিন্তু ফের যখন কাজে লাগল, তখন দেখা গেল তার হাতের ম্যাজিক অক্ষুণ্ণই আছে।

গোলাপ হাতে পড়াতে এলেন

ধর্মদাস মাস্টারমশাই ছিলেন রেলের টালিক্লার্ক। ছোটখাটো, কিন্তু ভারী সুন্দর চেহারা, সামান্য একটু মেয়েলি ভাব ছিল তাঁর মুখশ্রীতে। বড় বড় চোখ। প্রথম দিন এলেন হাতে একটা গোলাপ নিয়ে। মুখে মিষ্টি হাসি। যেন স্বপ্নে মাখানো মুখচোখ। আমাকে আর দিদিকে প্রাইভেট পড়াতেন। দোমোহানিতে রেলের অনেক অফিস-টফিস ছিল, সঙ্গে রেলশহর। মাস্টারমশাইয়ের তখন নিতান্তই ছোকরা বয়স। বিয়ে করেননি। বোধহয় কোনও মেসবাড়িতে থাকতেন। আর দু'বেলাই ভাত খেতে আসতেন আমাদের বাড়িতে।

আমি আর দিদি দুজনেই তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। ধর্মদাস মাস্টারমশাই খুব খেটে আমাদের পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গিও ছিল চমৎকার। রাগারাগি নেই, গায়ে হাত তুলতেন না, বার বার বুঝিয়ে দিতেন।

সেই চল্লিশের দশকে দোমোহানিতে মানুষের প্রমোদের উপকরণ বড় একটা ছিল না। রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের একটা গুদামের মতো হলঘরে সিনেমা দেখানো হত। সেখানেই হত মাঝে মাঝে পালে-পার্বণে নাটকাভিনয়। রেলের বাবুরাই রাজা-উজির সাজতেন। কত নাটকই যে হত, সব নাম আজ আর মনে নেই। তবে খুব জনপ্রিয় ছিল সিরাজউদ্দৌল্লা, কেদার রাজা, দুই পুরুষ, কঙ্কাবতীর ঘাট, টিপু সুলতান।

নাটকে মহিলা চরিত্রে এবং বিশেষ করে নায়িকার ভূমিকায় ধর্মদাস মাস্টারমশাই ছিলেন বাঁধা। আর মেয়ে সাজলে তাঁকে পুরুষ বলে চেনে কার সাধ্য! মহিলার ভূমিকায় এত ভাল অভিনয়ও করতেন যে, যারা তাঁকে চিনত না, তারা ভাবত সত্যিই বুঝি কোনও সুন্দরী মহিলাকেই মঞ্চে নামানো হয়েছে। আর তেমনই রপ্ত ছিল তাঁর মেয়েলি রংঢং।

মাস্টারমশাইয়ের এই মেয়ে সাজার ব্যাপারটাকে আমি বিশেষ ভাল চোখে দেখতাম না। মাঝে মাঝে বলেই ফেলতাম, মাস্টারমশাই, আপনি কেন মেয়ে সাজেন? লজ্জা করে না?

দূর! অভিনয় তো আর সত্যি নয়।

মনে আছে এক বার বোধহয় কঙ্কাবতীর ঘাট-এ মাস্টারমশাইয়ের অভিনয় দেখে আমার মা তাঁকে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন।

এর পর আমরা যথারীতি বদলি হয়ে যাই। নানা জায়গায় ঘুরে শেষে আলিপুরদুয়ার জংশনে বাবা পোস্টিং পাওয়ার পর ফের ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি তখন বুকিং ক্লার্ক। কিছু দিন আগে বিয়ে

করেছেন। বউকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের বাংলোয় এসে মা-বাবাকে প্রণাম করে যেতেন। আমার বাবা তাঁর ওপরওয়ালা, এবং খানিকটা ভাগ্য-নিয়ন্তাও।

তখন আমরা উঁচু ক্লাসে পড়ি এবং আমাদের পড়াতে আসেন প্রভাস চক্রবর্তী নামে এক জন বেশ শিক্ষিত মানুষ। ধর্মদাস মাস্টারমশাই আমাদের আর পড়াতে পারতেন না।

হঠাৎ শুনলাম, ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের প্লুরিসি হয়েছে। ছুটি নিয়ে তিনি দেশে চলে গেলেন সস্ত্রীক। শোনা গেল তিনি গুরুতর অসুস্থ। মাস চারেক তাঁর কোনও পাত্তাই ছিল না। এক দিন সকালে এক জন মোটাসোটা ভদ্রলোক যখন হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের বাড়িতে এলেন, তখন তাঁকে ধর্মদাস মাস্টারমশাই বলে চেনে কার সাধ্য! সেই ছিপছিপে চেহারা, কমনীয় মুখশ্রী উধাও। মোটা হয়ে কেমন ঢ্যাপসা হয়ে গেছে চেহারা!

এর পর মাস্টারমশাইয়ের দুটো ছেলে হল। তিনি আরও সংসারী হলেন, সঞ্চয়ী হলেন, ভিতুও হয়ে গেলেন। বাবা তাঁর বস বলে খাতির করতেন, সে অন্য কথা। কিন্তু আমি বা দিদি তো তাঁর ছাত্র এবং ছাত্রী। তবু তিনি আমাদের অনাবশ্যক খাতির করা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে গেলে বউদিও আমাদের বড্ড বেশি খাতির, যত্ন, সমীহ করতে থাকেন। কিন্তু মানুষটি ছিলেন ভারী ভাল। তাই মাঝে মাঝে যেতাম তাঁদের কোয়ার্টার্সে।

হঠাৎ মাস্টারমশাইকে টাংলা নামে একটা জায়গায় বদলি করা হল। তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি আমাদের বাড়িতে এসে মায়ের কাছে বিস্তর কান্নাকাটি করলেন, মাসিমা, টাংলাতে গেলে আমি ছেলেপিলে নিয়ে বেঘোরে মারা পড়ব। মা বাবাকে সন্তর্পণে বলেওছিলেন, কিন্তু বদলি রদ হয়নি।

মাস্টারমশাই চোখের জল মুছতে মুছতে টাংলায় গেলেন। যত দূর মনে হয়, টাংলাতে গিয়ে তাঁর রোজগার বেড়ে যায় এবং সেখানে তিনি দিব্যি ছিলেন। বছর দুই বাদে ফের ঘন ঘন তিনি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে থাকেন আমার মায়ের কাছে। লিখতেন, মাসিমা, শুনিতেছি আমাকে টাংলা হইতে অন্যত্র বদলি করা হইবে। তাহা হইলে ছেলেপিলে নিয়ে আমি বেঘোরে মারা পড়িব। মেসোমশাইকে বলিয়া দয়া করিয়া আমার বদলি আটকাইবেন।

এ রকম ভাবে যত বার বদলি হতেন, তত বার চিঠি লিখতেন। এবং তাঁর প্রিয় গৎ ছিল 'ছেলেপিলে নিয়ে বেঘোরে মারা পড়ব।' কিন্তু কোনও বারই নতুন জায়গায় গিয়ে তিনি মারা পড়েননি। বরং বহাল তবিয়তেই ছিলেন।

স্থূলকায়, হাঁসফাঁস করা, ভিতু, উদ্বিগ্ন মাস্টারমশাইকে দেখে বিশ্বাসই হত না যে, এক দিন এক জন ছিপছিপে তরুণ সুদর্শন লাজুক যুবক হাতে একটি গোলাপ নিয়ে আমাদের ভাইবোনকে পড়াতে আসতেন এবং ইনিই তিনি।

তাঁর বিষাদ লোককে টানত

কোচবিহার কোনও দিনই তেমন রমরমা শহর ছিল না। কিন্তু একটা করদ রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পিত, সুন্দর, ছবির মতো শহর। অনেকগুলো দিঘি ছিল, পামগাছের সারি ছিল, আর হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ বা হোস্টেলের চমৎকার স্থাপত্য, শহরে পা দিলেই চার দিকটা দেখে স্বতঃস্ফূর্ত মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটত মানুষের, 'বাহ্!' হ্যাঁ, তখনকার কোচবিহার, অর্থাৎ স্বাধীনতার কয়েক বছর পর, উদ্বাস্তু-আগমন সত্ত্বেও ছিল একটি অন্য রকম শহর। সব রাস্তা সোজা ও সটান, রাস্তার ধারে সযত্নে লাগানো মহার্ঘ গাছ, পার্ক, মন্দির। নিয়মিত ঝাঁটপাট এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা চালু ছিল তখনও। আর রাস্তার ধারে ধারে গজিয়ে ওঠা দোকানপাটও ছিল না।

বাবার বদলির চাকরির দরুন লেখাপড়া মার খাচ্ছিল বলে ১৯৫১ সাল নাগাদ আমাকে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি করে দেওয়া হয়। আস্তানা স্কুলের হোস্টেল। আমাদের দৈনন্দিন জিনিসপত্র কিনতে যেতে হত বাজারে। ছোট বাজার, দোকানপাট খুব বেশি নয়। সাবান, টুথপেস্ট বা ব্রাশ, তেল, দিস্তা কাগজ, পেনের কালি, এ সব কিনতে বাজারেই যেতে হত। তখন অনেকেরই নস্যির নেশা ছিল। বাজারে একটা ছোট স্টেশনারি দোকান ছিল। এক জন রোগা, বিষণ্ণ চেহারার শান্ত যুবক দোকান চালাতেন। সবাই বলত বুড়োদা। বুড়োদার বিশিষ্টতা ছিল এটুকুই যে, খুব কম কথার মানুষ, লাজুক, নির্বিরোধী এবং বোধহয় একটু ভিতু টাইপেরও। অন্য সব দোকান ছেড়ে সব ছেলেই ওই বুড়োদার দোকানেই কেন হানা দিতাম, তা কে জানে! তবে লোকটির একটা অদ্ভুত শান্ত, অপ্রতিরোধী আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সেটা কেন, তা আজও ভেবে পাই না। তিনি যে আমাদের সঙ্গে খুব একটা গল্প-টল্প করতেন, এমনও নয়। তবে গিয়ে দাঁড়ালে একটু হাসির আভা ফুটত মুখে, কোনও জিনিস কিনে তা ফেরত দিতে গেলে বিনা প্রশ্নে, অখুশি না হয়ে ফেরত নিয়ে পয়সা দিয়ে দিতেন। কোনও খদ্দেরের সঙ্গে কোনও দিন তাঁর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা হয়নি।

অনেক সময় জলখাবার খেতে মাখন-পাউরুটি কিনে আনতাম। তখন দিশি মাখন পাওয়া যেত না। মাখন আসত অস্ট্রেলিয়া থেকে, কৌটোজাত হয়ে। তাতে তৈরির তারিখ বা এক্সপায়ারি ডেট লেখার বালাই ছিল না। জাহাজে করে আসা মাখনের কৌটো খুলে কখনও কটু গন্ধ পেয়ে সেই কৌটোই বুড়োদাকে ফেরত

দিতে নিয়ে গেছি। বুড়োদা বিনা প্রশ্নে ফেরত নিয়েছেন, তাতে তাঁর কত গচ্চা গেছে তা-ও আমাদের বলতেন না কখনও।

অন্য সব দোকানে দু'পয়সার নস্যি কিনলে একটুখানি দিত। বুড়োদা অনেকটা দিতেন, কৌটো ভরে যেত। তার মানে এই নয় যে, উনি নিজের ক্ষতি করে আমাদের মন রাখতেন। দোকানের বিক্রি এতটাই বেশি ছিল যে, অন্য সব দোকানদার তাঁকে রীতিমত হিংসে করত। ধীরে ধীরে দোকানের যে বেশ উন্নতি হচ্ছিল, তা আমরা বেশ বুঝতে পারতাম। আর শুধু ছাত্ররাই তো নয়, তাঁর খদ্দের ছিল সারা শহরেই।

যত দূর মনে আছে, দোকানটার নাম ছিল মনোহারি বিপণি। দোকানের উন্নতি হল বটে, কিন্তু বুড়োদার মুখের বিষণ্ণতাটি গেল না। তাঁর স্নিগ্ধ চোখ দুটিতেও এক গভীর বিষাদ দেখতে পেতাম। মুখের হাসিটিতেও তার ছোঁয়া ছিল। অনেক ভেবেছি, বুড়োদার প্রতি মানুষের অমোঘ আকর্ষণের কারণ কি ওই বিষাদ? হবে হয়তো। না হলে আর কী-ই বা হতে পারে? যাঁর প্রগল্ভতা নেই, স্মার্টনেস বা আদিখ্যেতা নেই, পাকা দোকানদারের পেশাদারিত্ব নেই, তিনি এত জনপ্রিয় হন কী ভাবে?

কোচবিহারে স্কুল-কলেজ মিলিয়ে আমি বছর চারেক ছিলাম। ওই চার বছর আমি এবং আমরা সবাই বুড়োদার দোকান ছাড়া অন্য কোনও দোকান থেকে কিছু কিনতে যেতাম না। শেষে এমন দাঁড়াল যে, দোকানে সন্ধেবেলা রীতিমত লাইন পড়ে যেত।

জীবনে আমি নানা জায়গায় নানা দোকানদার দেখেছি। কিন্তু বুড়োদার কথা এত দিন পরেও এত স্পষ্ট করে কেন মনে পড়ে, ভেবে পাই না। কয়েক হাজার দোকানদারের ক'জনকেই বা স্মরণে রাখা যায়?

এক শীতের সন্ধেবেলা কী একটা কিনতে বুড়োদার দোকানে গেছি। কোচবিহারের কনকনে শীতে সেই সন্ধেবেলা বুড়োদার দোকানে আর কোনও খদ্দের ছিল না। বুড়োদা বোধহয় বই-টই কিছু একটা পড়ছিলেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন। এ কথা-সে কথার পর আমি বললাম, 'বুড়োদা, আপনি কেন আর একটু বড় দোকান করছেন না? এইটুকু একরত্তি দোকানে এত ভিড় সামলান কী করে?' হাসিমুখেই বুড়োদা বললেন, 'দোকান তো আমার নয় ভাই।' আমি হাঁ, 'আপনার নয়?' 'না তো, আমি তো কর্মচারী। সামান্য বেতন পাই।' আমি প্রায় আঁতকে উঠে বললাম, 'সে কী? তবে কার দোকান?' 'তিনি অন্য জায়গায় থাকেন।' হতাশায় মনটা ভরে গেল। চোখে প্রায় জল। কত কাল আগে কোচবিহার ছেড়েছি। জানি না, বুড়োদার নিজের দোকান কখনও হয়েছিল কি না।

পশ্চাদ্দেশে দিল এক কামড়

ময়মনসিংহের হর্ষ ডাক্তার ছিলেন এলএমএফ। তবে তাঁর বেশ পসার ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা হর্ষবাবু রুগি দেখে বেড়াতেন। ছোটখাটো, খুব ফরসা, মৃদুভাষী মানুষ। হঠাৎই শোনা গেল তাঁর এক মেয়ের সঙ্গে আমার জ্যাঠতুতো বড়দার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তখন আমার বয়স বড়জোর বছর পাঁচ বা ছয়।

সেই বিয়েতে আমি ছিলাম নিতবর। তবে বিয়ে দেখার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বউদির সঙ্গে প্রথম দেখা বউভাতের দিন, সকালে। মহিলা-পরিবৃতা হয়ে বউদি বড় ঘরের মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে ছিল। বড়দা আমাকে কোলে তুলে ঝপাস করে নতুন বউদির কোলে বসিয়ে দিল। বউদি সস্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর আমি বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ, এত সুন্দর কোনও মানুষ হয়? যেমন ফরসা রং, তেমনই টানা টানা চোখ, নাক আর মুখের ডৌল। বউদির রূপের কথা মুখে মুখে ছড়িয়েও গিয়েছিল। শুধু একটু বেঁটে ছিলেন। তা আমার জ্যাঠতুতো দাদারাও বেঁটেই। কাজে, বউদি ও দাদার জোড় ভালই মিলেছিল। গল্পটা অবশ্য বউদির নয়, টমির। বউদির বাপের বাড়িতে দুটো সাদা রঙের দিশি হাউন্ড কুকুর ছিল। টমি আর ভমি। দুজনের মধ্যে এক জন অর্থাৎ টমি, বউদির সঙ্গেই আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিল। বেশ লম্বা-চওড়া, বলবান কুকুর। তেমনই তেজ।

কুকুর ভালবাসতাম বলে টমির সঙ্গে ভাব হতে সময় লাগল না। বউদির যেমন বাধ্য ছিল সে, আমারও তেমনই বশ মেনেছিল। তবে, তেজস্বী, রাগী ও মারমুখো টমির জন্য বাড়িতে কিছু অশান্তি শুরু হল। অচেনা লোক, বেড়াল, নেড়ি কুকুরের পাল, কাকপক্ষী, ফিরিওয়ালা— কেউ আমাদের বিশাল উঠোন ও প্রান্তরওলা বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারত না। টমি সড়ালে কুকুর, হাঁকডাক কম, কিন্তু চকিতে বাঘের মতো তেড়ে গিয়ে আক্রমণে জুড়ি নেই। বাড়ি আসার ক'দিনেই পাড়ার নেড়ি কুকুরদের কয়েকটা তার কামড়ে ঘায়েল হয়। ধোপা কাপড় নিতে এসে পোঁটলা নিয়ে যেই বেরতে যাচ্ছে, টমি বিনা নোটিসে তার পশ্চাদ্দেশে এমন কামড় বসাল যে, বেচারা হাউমাউ করে সে কী কান্না! বাড়ির বেড়ালরা টিনের চালে আশ্রয় নিল। কেউ কেউ পাড়াছাড়া হল। প্রতিবেশিরাও আসা প্রায় বন্ধ করে দিল।

কেউ কেউ পরামর্শ দিল, শিকলে বেঁধে রাখার। কিন্তু শিকল পরানোর পর তার বিরক্তি ও লম্ফঝম্পে বিরক্ত হয়ে জ্যাঠামশাই-ই বোধহয় খুলে দিতে বললেন। টমির প্রধান দোষ ছিল ঘেউ ঘেউ না-করা। সে শব্দ

করা পছন্দ করত না, হঠাৎ আক্রমণই ছিল স্বভাব।

অমন সাদা ধপধপে কুকুর বড় একটা দেখা যায় না। তখনই আমার বুক-সমান উঁচু। পেশিশক্তিও যথেষ্ট। অন্য পাড়ার কুকুর প্রথম প্রথম তার সঙ্গে দল বেঁধে লাগতে এলেও একা টমির প্রবল প্রতি-আক্রমণে তারা গো-হারা হেরে, রক্তাক্ত হয়ে পালানোর পথ পেত না।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা আমাকে রাস্তায় পেলে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা একটা গুন্ডা কুত্তা পুষছ নাকি? কামটা ভাল করো নাই।

টমি দিশি কুকুরদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জাতের। আমি অবশ্য আগাগোড়া টমির কীর্তিকলাপ লক্ষ করার সুযোগ পাইনি। বাবা-মা, দিদির সঙ্গে বাবার কর্মস্থলে চলে যেতে হল। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ময়মনসিংহে বেড়াতে আসতাম, টমির সে কী উল্লাস! লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করত। কিন্তু তার বিরুদ্ধে রাজ্যসুদ্ধ লোকের অভিযোগ। কত লোককে যে কামড়েছে, হিসেব নেই। তার ভয়ে আমাদের বাড়ি অনেকেই বয়কট করে বসে আছে।

কিন্তু টমিকে আমার দুষ্টু কুকুর বলে কখনও মনে হত না। তাকে মাংস বা পুষ্টিকর কিছুই খাওয়াতাম না। এঁটোকাঁটা খেত। ভাতের সঙ্গে ডাল বা মাছের ছিবড়ে-জাতীয় নিকৃষ্ট খাবার। তবু পরাক্রম কখনও হ্রাস পায়নি। যদিও শক্তিতে হয়তো ধীরে ধীরে ভাটা পড়ছিল। কুকুরের পুষ্টি নিয়ে ভাবনার চল তো তখনও হয়নি। এক বার গিয়ে দেখলাম, টমির পিছনের বাঁ পায়ের গাঁটটা লাল হয়ে ফুলে আছে এবং সে একটু লেংচে হাঁটছে। এ যুগে হলে টমিকে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু তখন পশু চিকিৎসকেরও বড্ড অভাব ছিল।

পাড়ার যে সব কুকুরকে সে আঁচড়ে-কামড়ে পাড়া-ছাড়া করেছিল, তারা প্রায়ই দল বেঁধে তার ওপর হামলা করত। টমি একলা বীরপুরুষ। সে একা দশ জনের সঙ্গে বরাবরের মতোই লড়াই করেছে। কিন্তু বয়স হচ্ছিল। আগের ক্ষমতা আর ছিল না। আমার সামনেই বারবাড়ির মাঠের এক ধারে শুকনো নালায় তাকে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আট-দশটা কুকুর। আমি লাঠি নিয়ে ছুটে গিয়ে বিস্তর চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করি বটে, কিন্তু তত ক্ষণে তার প্রায় সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। হ্যা হ্যা করে হাঁফাচ্ছিল। বাড়িতে গিয়ে আয়োডিন-টায়োডিন দেওয়া হল। সেটা ঠিক চিকিৎসা হল না। বুঝতে পারছিলাম, টমির বয়স হচ্ছে। বড়দা চাকরি পেয়ে বউদিকে নিয়ে চলে গিয়েছে। হর্ষ ডাক্তারবাবু মারা গেছেন। টমির দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। শেষে টমিকে শিকল পরালাম। আপত্তি করল না। যেমন ঝিমোচ্ছিল, তেমন ঝিমোতে লাগল। বাকিটা থাক। ওটা উচ্চারণ করার দরকার কী!

সবাই 007 নয়, কেউ 000

ইংরেজরা চলে যাওয়ার এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে বাবা যখন শিলিগুড়িতে বদলি হলেন, তখন আর পথেঘাটে বা অফিস-কাছারিতে লালমুখোদের দেখাই পাওয়া যায় না। বলতে কী, তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালে এ দেশে সাহেবদের ঘোর অনটন। এমনকী শিলিগুড়িতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানও ছিল না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরই সাহেবরা উধাও হয়ে গেল। অথচ মাত্র সাত-আট বছর আগেও শহরে মফস্‌সলে সাহেবরা গিজগিজ করত। বাবার সহকর্মী সাহেবরা প্রায়ই এসে আমাদের রেল-বাংলোয় লাঞ্চ বা ডিনার করে যেত। সেই সব আচমকা-অতিথিদের জন্য আলাদা করে রান্না করার সময়ও মা পেত না। তারা দিব্যি সরষে-বাটা দিয়ে রান্না করা মাছ, ফুলকপির ডালনা বা ডাল আর ভাত নাকের জলে চোখের জলে হয়ে সাপটে খেত। তারা বেশির ভাগই রেলের কর্মচারী, বাবার সহকর্মী। কাটিহারে বা মাল জংশনে কিংবা দোমোহানিতে আমাদের চারপাশে সাহেবদেরও কোয়ার্টার বা বাংলো ছিল। ফলে সাহেব দেখে দেখে বড় হয়েছি।

মনে আছে কাটিহারে, যখন আমার ছয়-সাত বছর বয়স, ভীষণ দুষ্টু আর ডানপিটে বলে বদনাম ছিল, তখন সাহেবপাড়ার নির্জন রাস্তায় টো-টো করে ঘুরতাম, কার বাগান থেকে কোন ফলপাকুড় চুরি করা যায় তার ধান্দায়। আমাদের বাংলোর পিছন দিকে একটা ভারী সুন্দর বড় বাংলোয় বেশ কয়েকটা কাশীর পেয়ারার গাছ ছিল। খুব লোভ হত। কিন্তু সেটা লালমুখোদের বাড়ি, এবং রাগী কুকুরও ছিল সেই বাড়িতে। এক দিন আমি আর টুনটুনিয়া নামে একটি বিহারি ছেলে ওই বাংলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, সেই বাড়ির ছোট ছোট গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে নিচু পেয়ারাগাছে উঠে খুব হইচই করছে। আমি বরাবর মুখচোরা, টুনটুনিয়াকে বললাম, ওদের কাছে পেয়ারা চেয়ে নে না! টুনটুনিয়া এগিয়ে গিয়ে ওদের উদ্দেশে হিন্দিতে বলল, পেয়ারা দেবে? খোকাবাবু চাইছে। বাচ্চাগুলো প্রথমে অবাক হয়ে থমকে গেল, তার পর হঠাৎ আমাকে দেখে কলকল করে উঠল, রুণু! রুণু! কী করে ওরা আমার নাম জানত কে জানে। কিন্তু তার পরই পটাপট ডাঁসা এবং পাকা পেয়ারা পেড়ে আমাদের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল। জামার কোঁচড় ভরে সেই পেয়ারা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আর সেই পেয়ারার গায়ে কী যে সুন্দর পারফিউমের সুবাস লেগে ছিল!

শিলিগুড়িতে আচমকাই এক দিন এক টকটকে ফরসা রং আর নীল চোখের সাহেবকে আবিষ্কার করে আমি অবাক। সাহেব, কিন্তু ঠিক সাহেবের মতো সাহেব নয়। যে সব ডাকাবুকো হার্মাদ সাহেব দুনিয়া দাপিয়ে আধিপত্য করে বেড়ায়, এ যেন তাদের কেউ নয়। শুধু চেহারাটা সাহেবের মতো। গায়ে চেকারের

ইউনিফর্ম, কিন্তু শরীরে ফিট করেনি। পাতলুন ঝুলে অন্তত তিন-চার ইঞ্চি ছোট, বোতাম খোলা কোটটাও বেঢপ।

যত দূর মনে আছে, তার নাম ছিল বোধহয় নেলসন। শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনটির এক সময় খুব রমরমা ছিল। তখন সাহেব আমলে সাহেবরা দার্জিলিং মেল-এ এসে সকালে টয় ট্রেনে চেপে দার্জিলিং যেত।

এখনও টাউন স্টেশনের কাঠামোতে পুরনো ঐতিহ্যের চিহ্ন আছে। বিশাল সরাবজি-র রেস্টুরেন্ট ছিল স্টেশনে, ইংলিশ ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হত। হ্যাম অ্যান্ড এগ, টোস্ট বাটার, কেক, ক্রিম, চিকেন কাটলেট, খাঁটি দার্জিলিং চা। সকালে গমগম করত জায়গাটা।

নেলসন সেই আমলেরই লোক। কিন্তু সম্ভবত ইংরেজদের চোখে সে ছিল কুলাঙ্গার। কারণ এত নিরীহ সাহেব আমি আর কখনও দেখিনি। গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করত। কেউ টিকিট দিত না। বাড়ানো হাতটা ঠেলে যে যার বেরিয়ে চলে যেত। নেলসন কখনও বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরত না।

স্টেশন মাস্টারের ছেলে বিজয় ছিল আমার বন্ধু। সে নস্যি নিত। নেলসন তাকে দেখলেই 'বিজে' বলে হাঁক দিত। তার পর নস্যি চাইত। কুলিদের কাছ থেকে অম্লানবদনে খৈনি চেয়ে নিত সে। কারও কাছ থেকে বিড়ি বা সিগারেট।

নেলসন বিয়ে করেছিল দিশি কোনও মহিলাকে। শুনতাম তার বউ বেশ দজ্জাল, নেলসনকে খুবই শাসনে রাখে। বাজারে গিয়ে নেলসনকে শাকপাতা, চুনো মাছ বা কচুঘেঁচুও কিনতে দেখেছি। সব দিক দিয়েই সে হয়ে গিয়েছিল ভেতো এবং ঝাঁজহীন ভারতীয় এবং অনেকটাই বাঙালি। তবে কক্ষনও তাকে হিন্দি বা বাংলা বলতে শুনিনি। ওই একটা ব্যাপারে সে বরাবর সাহেব থেকে গিয়েছিল। উচ্চারণও ছিল ব্রিটিশ। সেখানে কোনও খাদ আমার কানে ধরা পড়েনি।

বিজয়কে এক বার জিজ্ঞেস করেছিলাম, নেলসনের বয়স কত? বিজয় ঠোঁট উলটে বলল, কে জানে? সত্তর-টত্তর হবে বোধহয়। তবে চাকরি করছে কী ভাবে? রিটায়ার করেনি? তাও জানি না। বোধহয় বয়স কমিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিল।

বাস্তবিক নেলসনকে যখন আমি প্রথম দেখি তখনই সে বেশ বুড়ো। তখন রেলের নিয়মে আটান্নতে অবসর নেওয়ার কথা। অথচ তখনও সে দিব্যি চাকরি করছে। রেলের ছোট্ট খুপরি কোয়ার্টারে থাকত সে। সেখানে কমোড ছিল না। তবে নেলসন নাকি দিশি জলভাতও চামচ-কাঁটা দিয়ে খেত। হাতে নয়। ও ব্যাপারে সে ছিল খাঁটি সাহেব। আর একটা ব্যাপারও ছিল। হ্যাট ছাড়া তাকে কখনও দেখিনি।

নেলসনের সঙ্গে আমি একটু ভাব করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তেমন সুবিধে হয়নি। কথা সে বিশেষ বলতে চাইত না। কোনও এক দুর্বোধ্য কারণে ভিতরে একটা কপাট সে বরাবর বন্ধ রাখত। শুনেছি বউয়ের

সঙ্গে ঝগড়াও করত না সে।

পরে সাহেবদের দেশে গিয়ে অনেক বার দেখেছি সাহেবদের মধ্যে সবাই কিন্তু দিগ্বিজয়ী হার্মাদ নয়। নেলসনের মতো বিস্তর নির্বিরোধী, নিরীহ, ভিতু সাহেব যে সব দেশে বসবাস করছে, তারা কেউ জিরো জিরো সেভেন নয়। আমাদের মতোই জিরো জিরো জিরো।

টুপটুপাটুম মানে কী

আমার আর দিদির স্কুল-টুলে পড়ার তেমন সুযোগ ছিল না। বাবা বারবার বদলি হতেন, সব জায়গায় স্কুল ছিলও না, আর ভর্তি হলেও বছর ঘুরবার আগেই হয়তো তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর এক জায়গায় চলে যেতে হত। তাই বরাবর আমাদের ভরসা প্রাইভেট টিউটর। কত যে বিচিত্র মাস্টারমশাইদের কাছে আমাদের পড়তে হয়েছে তার হিসেব নেই।

তখন ময়মনসিংহে। আমরা তখন খুব ছোট। এক ছোকরা বাঙাল মাস্টারমশাই বহাল হলেন আমাদের পড়ানোর জন্য। ময়মনসিংহের বাড়ির দাদু আর ঠাকুমার ঘরটাকেই বড় ঘর বলা হত। আসলে বড় ঘরটাই ছিল সারা বাড়ির প্রাণকেন্দ্র এবং সেটা বৈঠকখানাও বটে। প্রাইভেসির কোনও বালাই-ই ছিল না। মাঠের মতো বিশাল জোড়া দেওয়া খাটে দাদু আর ঠাকুমা শুতেন, আর তাঁদের সেই দাম্পত্যের মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে বিস্তর কুচোকাঁচাও ঢুকে পড়ত। অর্থাৎ দাদু-ঠাকুমার নাতি ও নাতনিরা। সে তো শয্যা নয়, যেন হাট। কারও দাঁত কড়মড় করে, কেউ ঘুমের মধ্যে হিসি করে দেয়, কারও গল্প শোনার বায়না, সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। তাতে দাদু বা ঠাকুমার কোনও বিকার দেখিনি। বড়জোর ঠাকুমা চড়টা-চাপড়টা দিয়েছেন, আর দাদু রেগে গিয়ে বলেছেন, নিব্বইংশার পো। তার বেশি কিছু না।

সেই বড় ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে হ্যারিকেনের আলোয় আমাকে আর দিদিকে পড়াতে আসতেন যোগেন মাস্টারমশাই। রোগা খ্যাটখ্যাটে চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, হাস্যবিহীন মুখ। এক দিন বাংলা রিডিং পড়তে দিলেন। পড়ার পর গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার উরুশ্চারণ ঠিকমত হয় না। ওইটা ঠিক করতে হইব, বুঝলা?

বুঝলাম। বইতে এক একটা অংশ দাগিয়ে দিয়ে বলতেন, এইটা টুপটুপাটুম মুখস্থ করবা, বুঝলা? বুঝলাম, কিন্তু 'টুপটুপাটুম' কথাটার অর্থ ধরতে পারতাম না। দিদিকে জিজ্ঞেস করলে ঠোঁট উলটে বলত, কে জানে? ধরে নিয়েছিলাম, টুপটুপাটুম মানে ভাল করে মুখস্থ করাই হবে।

এক দিন সন্ধেবেলা বসে যোগেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়া করছি, হঠাৎ মনে হল, ঘরটা দোলনার মতো দুলছে। হ্যারিকেনটা উলটে পড়ে গেল, আমি কুমড়ো গড়াগড়ি। যোগেন মাস্টারমশাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দুই লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড় ঘরেই এক ধারে ঠাকুরের আসন। মস্ত কাঠের সিংহাসনে জগন্নাথদেব থেকে শুরু করে বালগোপাল পর্যন্ত গুচ্ছের ঠাকুরদেবতা আর আমাদের গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর ছবি। সেইখানে বসে লেংড়ি পিসি জপ করছিলেন। পাটাতন থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙেছিল বলে তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন বলে তাঁর ওই নাম। আসলে উনি ছিলেন দাদুর বালবিধবা বোন এবং সম্পর্কে আমাদের ঠাকুমা। তা সেই লেংড়ি পিসিই চেঁচিয়ে উঠলেন, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

ভূমিকম্প কাকে বলে তা তখন জানিই না। তাই হাঁ করে সেই দুলুনির মধ্যে বসে রইলাম। তবে দিদি আমাকে জাপটে ধরে ছিল, মনে আছে। কিন্তু মাস্টারমশাই সেই যে হাওয়া হলেন, তার পর দু'দিন আসেননি।

যোগেনবাবুর চাকরি হচ্ছিল না বলে খুব দুঃখ। নানা জায়গায় দরখাস্ত করেন, দরবার করেন, কিন্তু চাকরি হচ্ছিল না কিছুতেই। সব সুযোগই নাকি 'হইতে হইতেও হইল না, ইস, অল্পের লিগ্যা ফস্কাইয়া গ্যাল।' অবশেষে কালীবাড়ির কাছে রাস্তার ওপর একখানা দোকান খুলে বসলেন মাস্টারমশাই। লজেন্স-চকলেট, খাতা-পেনসিল, বিড়ি-সিগারেট, এ-সব বিক্রি হয়। তবে সন্ধেবেলা আমাদের পড়াতে আসতেন ঠিকই।

তখন আত্মীয়স্বজনদের ফাইফরমাশ খাটা আমাদের নিয়মের মধ্যেই ছিল। তা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই কেউ এক দিন আমাকে ডেকে হাতে দুটো তামার পয়সা দিয়ে বলল, যা তো রুণু, দুই পয়সার বিড়ি লইয়া আয়। আমি পাঁইপাঁই করে ছুটে মাস্টারমশাইয়ের দোকানে হাজির হয়ে বললাম, মাস্টারমশয়, দুই পয়সার বিড়ি দ্যান। যোগেন মাস্টারমশাই ভারী অবাক হয়ে আমার দিকে অতি সরল মুখে প্রশ্ন করলেন, তুমি বিড়ি খাইতা? আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, না মাস্টারমশয়, অমুক কাকার লিগ্যা। মাস্টারমশাই নিশ্চিন্ত হয়ে বিড়ি দিলেন।

চাকরি আর তাঁর হয়নি। তবে যত দূর জানি, তাঁর দোকানটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে।

সমস্যা হল 'টুপটুপাটুম' শব্দটা নিয়ে। দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ বছর আমি নানা সময়ে ওই শব্দটির অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্কে আমার গুরুভাই দিবাকরের বাড়িতে কিছু দিন ছিলাম। সে ময়মনসিংহের লোক, তার ছেলের নাম 'দিবালোক', কিন্তু বলার সময়ে বলে 'দিবালুক'। কিছুতেই ছেলেটি বা তার মা-বাবাকে দিয়ে 'দিবালোক' উচ্চারণ করাতে পারিনি। তখনই হঠাৎ এক দিন 'টুপটুপাটুম' শব্দটিরও রহস্যভেদ হয়ে গেল। ময়মনসিংহ মানেই হচ্ছে উ-কার। সেই ফরমুলায় ফেলে জলের মতো বুঝতে পারলাম, 'টুপটুপাটুম' কথাটার মানে হচ্ছে 'টপ টু বটম'। এই সোজা কথাটা বুঝতে বড্ড লম্বা সময় লাগল, এই যা।

আমার বমা, তোদের কী!

আমার জেঠিমা ছিলেন ঢাকার মেয়ে। খুব ফরসা আর গোলগাল চেহারা ছিল তাঁর। আর প্রতিমার মতো বড় বড় চোখ। একটু মোটাসোটা ছিলেন বটে, কিন্তু ভারী চটপটে আর কাজের মানুষ। আমরা, অর্থাৎ আমি, দিদি আর ভাইবোনরা তাঁকে ডাকতাম 'বমা' বলে। বমা হল বড়মার সংক্ষেপ। আমি জন্মাবধি বমা-র ন্যাওটা ছিলাম। বমা আমাকে ডাকতেন 'সোনার গোপাল', আমার আর সব তুতো-ভাইবোনেরা এই আদর-সোহাগ বিশেষ পছন্দ করত না। এক-এক জন বলেই ফেলত, সোনার গোপাল না গোবরের গোপাল। আসলে আমি ছিলাম যেমন দুষ্টু, তেমনই দামাল। কিন্তু হলে কী হয়, আমার দুটি খুঁটির খুব জোর ছিল। এক হল দাদু, আর বমা। এই দুজনের অমিত প্রশ্রয়ে আমি যা খুশি করেও দিব্যি রেহাই পেয়ে যেতাম। আমাদের দিশি ভাষায় রান্নাঘরকে বলে পাকঘর। আমাদের বাড়িতে দুটো পাকঘর ছিল— একটা আমিষ, একটা নিরামিষ। আমিষ পাকঘরটি ছিল বিশাল বড়, কাঠের জ্বালে রান্না হত। এক জন রান্নার ঠাকুরও ছিলেন। তাঁর নাম সুদর্শন, বাস্তবিকই সুদর্শন। লম্বা আর ফরসা চেহারা। বিহারি বামুন। তাঁকে বিক্রমপুরের রান্না শিখিয়েছিলেন বমা। তবে বমা নিজেই সকালের দিকটায় রান্নাঘরে বহাল থাকতেন। আমাদের বাড়ির রেওয়াজ ছিল, পইতে না-হওয়া বাচ্চারা সকালের জলখাবার হিসেবে ভাতই খাবে। তুতো-ভাইবোনদের নিয়ে আমরা পাঁচ-ছ'জন সকালের দিকে পাকঘরে পিঁড়ি পেতে গোল হয়ে বসতাম। মাঝখানে থালায় গরম ভাত আর গরম ফুটার ডাল। ফুটার ডাল মানে সেদ্ধ মুসুরির ডাল, যাতে সম্বরা পড়েনি তখনও, একটু ঘি দিয়ে মেখে সেই ভাত বমা আমাদের মুখে তুলে দিতেন। আর সেই সময় বমার সবচেয়ে কাছে, কোল ঘেঁষে বসানো হত আমাকে। অনেকে নালিশ করত, বমা নাকি আমার গরাসটা একটু বড় করে পাকাতেন। কখও-সখনও ডালভাতের সঙ্গে মাছভাজা জুটলে সেটাও নাকি আমাকেই বেশি করে খাইয়ে দিতেন। আমিও যে সেটা বুঝতাম না, তা নয়। তবে ব্যাপারটা আমার ন্যায্য বলেই মনে হত। বমা তো আমার, তোদের কী!

উঠোন ঘিরে চারটে আলাদা আলাদা ঘর ছিল আমাদের। উত্তরের ঘর বা বড় ঘর, পশ্চিমের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর আর বাইরে বিশাল কাছারি ঘর। জ্যাঠামশাই আর বমা তাঁদের চার কিশোর ছেলেকে নিয়ে থাকতেন দক্ষিণের ঘরে। সন্ধেবেলা দাদারা সব পুবের ঘরে পড়তে যেতেন। আর বমা সেই সময় আমাকে তাঁর বুকের ওপর শুইয়ে গল্প বলতেন। ডান হাতে হাতপাখাটা অবিরাম নড়ত। মুশকিল হত,

সন্ধেবেলা বহুরূপী আর মুশকিল আসান এলে, ভয় পেয়ে আমি বমার বুকের মধ্যেই হিসি করে দিতাম। আর বমা চেঁচিয়ে উঠতেন, এইটা কী করলি রে, সোনার গোপাল?

আমাদের বাড়িতে তখনও পেঁয়াজ-রসুন ঢোকেনি। মাছ হত, কিন্তু মাংস হত খুব কম। তা-ও বলির মাংস। তাতে পেঁয়াজ, রসুন দেওয়া হত না। সেই সময়ও আমার রন্ধন-পটীয়সী বমা যা রান্না করতেন, তা তাক লাগার মতো। সবাই ধন্য ধন্য করত। মুড়িঘণ্ট, চিতলের মুইঠ্যা বা পোলাওয়ে হত অবর্ণনীয় স্বাদ। একটু তেল-মশলার আধিক্য ছিল, এই যা। দৈনন্দিন কচুর শাক বা মাছের ঝোল বা মরিচঝোল (আসলে পাঁচমিশেলি চচ্চড়ি) বা ধোঁকার ডালনা বা তেতো এবং টকের ডাল ইত্যাদিও ছিল চেটেপুটে খাওয়ার মতো।

যখন দেশ ছেড়ে মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম, আমার মাত্র বছর চারেক হবে। মনোহরপুকুরের ভাড়াবাড়িতে থাকতাম, আর মনে হত যেন বিদেশে চলে এসেছি। কী যে খারাপ লাগত, বলার নয়।

সেই ভাড়াবাড়িতে এক বার বমা এলেন। সিঁড়ির তলা থেকেই 'সোনার গোপাল রে' বলে ডাকাডাকি। তার পর কত যে আদর! নাড়ু, তক্তি কত কী এনেছেন আমার জন্য।

কিন্তু দুষ্টুমি আমার মজ্জাগত। বাঁদর আর কাকে বলে! এক দুপুরে বমা শীতের রোদে লাগোয়া ছাদে মাদুর পেতে, এক পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। আমাদের ঘরে একটা ভাঁড়ে একটু রসগোল্লার রস ছিল। আমি একটুও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেই ভাঁড়ের রসটুকু সযত্নে বমার কানের মধ্যে ঢেলে দিলাম। 'কী করলি রে সোনার গোপাল, কী করলি?' বলে বমা চমকে উঠে বসলেন। সেই কান নিয়ে বিস্তর ভুগতে হয়েছিল বমাকে। কিন্তু আমার মা-বাবার শাসন থেকে আমাকে আগলে রাখলেন বমাই, আরে ও পোলাপান, ও কি আর বুইঝ্যা করছে?

দু-এক বছর পর,আমরা তখন কাটিহারের সাহেবপাড়ার এক রেল বাংলোর বাসিন্দা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কাটিহারে তখন মার্কিন আর ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিস্তর ভিড়। লালমুখো দেখে দেখে আমাদের অরুচি। সেই সময় দাদু, ঠাকুমা, জ্যাঠামশাই, বমা সবাই এসে হাজির। বাড়ি সরগরম। সকালে এক দিন দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি, রাস্তায় একটা চকচকে জিনিস পেয়ে কুড়িয়ে নিলাম। মিলিটারি অফিসারদের টুপিতে এ জিনিস লাগানো থাকে বলে অনুমান হল। জিনিসটা সোনার নয়, কিন্তু ভারী চকচকে এবং সুন্দর পাথর-বসানো। দাদুকে দেখালাম। দাদু বললেন, তোমার কাছে রাইখ্যা দাও।

বাড়িতে ফিরে সবাইকে দেখালাম। বমাকেও। বমা জিনিসটা দেখে খুব খুশি। আমার কী ইচ্ছে হল, কে জানে। বললাম, এইটা তোমারে দিলাম। বমা হাসিতে লুটোপুটি, আমারে দিলা? ও মা, কই যামু রে, এইটা আমারে দিলা? আইচ্ছা, আমার সোনার গোপালের চিহ্ন হিসাবে আমার কাছেই থাকব।

বমাকে তাঁর বিপুল ভালবাসার বিনিময়ে তেমন কিছু দিতে পেরেছি কি? মনে পড়ে না। শুধু একটা কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস।

আমি কি মনিষ্যির মতো মনিষ্যি

আমার হবু বউ তখন হুগলির এক গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতা করে। হাওড়া থেকে বর্ধমান মেন লাইনে লোকাল ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। স্টেশনে নেমে এক মাইল হাঁটা পথ। এখন ভাবলে যতটা দূর বলে মনে হয়, তখন কাঁচা বয়সে তা মনেই হত না। প্রতি রোববার হয় আমি গিয়ে হাজির হতাম, নয়তো সে চলে আসত কলকাতায়। আর তখন রোববারের জন্য সে কী হা-পিত্যেশ! ও ভারী মিশুকে মানুষ। যেখানে কাজ করত, সেখানকার ভূমিকন্যা সে নয়। তবু কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামের অনেক পরিবারের সঙ্গে তার দিব্যি ভাবসাব। মাসি-মেসোমশাইয়ের অভাব ছিল না।

তখন মোবাইল দূরস্থান, ল্যান্ডলাইন ফোনও আমাদের কাছে আকাশের চাঁদ। প্রেমিক-প্রেমিকাদের সে বড় সুখের দিন ছিল না। তাদের মাঝখানে লম্বা লম্বা বিরহ ও নীরবতা বিরাজ করত। শুধু এটুকু বলতে পারি, লম্বা বিরহের পর দেখা হলে ভারী ঝলমলে লাগত। বাড়তি আলো এসে পড়ত। বাড়তি রঙের ঢেউ খেলে যেত, এবং লজ্জাটজ্জাও হত একটু-আধটু। তা, এক দিন আমার হবু আমি যেতেই ভারী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, ওগো, সামনের রোববার আমি কলকাতায় যেতে পারব না। কিন্তু তোমাকে আসতেই হবে। জরুরি দরকার।

আমি তটস্থ হয়ে বলি, দরকারটা কীসের?

অতিশয় উত্তেজনার সঙ্গে সে যা বলল, তা থেকে বুঝলাম, জনৈকা মাসিমার বয়স্থা কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছে গাঁয়ের ঘটকী। পাত্র নাকি বেজায় ভাল। কিন্তু কানাঘুষো শোনা গেছে, পাত্র বুড়ো। ঘটকী অবশ্য বলছে যে, ও সব বাজে কথা। পাত্রের বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ।

সামনের রোববার পাত্র পাত্রীকে দেখতে আসছে। মাসিমা বিধবা মানুষ, সহায়-সম্বল নেই। তাই আমার হবুকে ধরেছেন, কনে দেখার সময় সে যেন হাজির থাকে। হবু বলেছে, সে তো থাকবেই। সেই সঙ্গে আমিও।

কিন্তু আমার ভূমিকা সেখানে কী হবে?

বাহ্! তুমি না পুরুষমানুষ! এক জন পুরুষমানুষ হাতে থাকা ভাল।

বুঝতে পারলাম না, বুড়ো পাত্রটি কন্যাহরণ করে নিতে আসছেন কিনা লাঠিসোঁটা নিয়ে। আর আমার তো বীর হিসেবে কোনও খ্যাতি নেই, ডাকাবুকোও নই, বলিয়ে-কইয়েও নই। কিন্তু প্রেম পর্যায়ে কাগজের

বাঘও হালুম গর্জন ছাড়ে। তাই রাজি হতে হল।

পরের রোববার মাসিমার বাড়িতে দুপুরে সমবেত হয়ে দেখলাম, অবস্থাটা বেশ বজ্রগর্ভ।

ছোট একটি ঘরের ভিতরকার দৃশ্যটা অনেকটা এ রকম: ত্রিশোর্ধ্ব একটি মেয়ে খুব সাজগোজ করে, লিপস্টিক-কাজল-টিপ-ঝলমলে শাড়িতে সেজে বসে আছে একটা চৌকিতে। সে একটুও সুন্দর নয়। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তীব্র আক্রোশ, এবং সে ফুঁসছে। পাশে করুণ মুখে মধ্যবয়স্কা এক বিধবা মহিলা দাঁড়িয়ে। আর দরজার কাছে মজবুত, চালু চেহারার এক মহিলা বেশ তেজালো গলায় ভাষণ দিচ্ছে, ওগো বলছি তো পাত্তরের বয়স পঁয়ত্রিশের একটি দিনও বেশি নয়। দাঁতও পড়েনি, চুলও পাকেনি। পঞ্চাশ বিঘের ওপর জোতজমি, মাসে দেড়-দু'হাজার টাকা বেতন, ঝাড়া হাত-পা, বুড়ি মা ছাড়া কেউ নেই...

আমার হবু গিয়ে মেয়েটির পাশে বসতেই সে তীব্র স্বরে বলল, পাত্র বুড়ো হলে কিন্তু অপমান করে তাড়িয়ে দেব!

একটু বাদেই সুধীরবাবু, অর্থাৎ পাত্র এলেন। একা, পরনে সাদামাটা ধুতি-পাঞ্জাবি, দোহারা চেহারা এবং তিনি সত্যিই বয়স্ক। পঞ্চাশ তো বটেই। বেশিও হতে পারে। দিব্যকান্তি না হলেও চেহারাটা খারাপ নয়। এবং অতিশয় নিরীহ। ঘরে ঢুকে দুজন অপরিচিত উটকো যুবক-যুবতীকে দেখে তিনি যে এতটা ঘাবড়ে যাবেন, সেটা অনুমানও করতে পারিনি।

সুধীরবাবুকে দেখে বকুল, অর্থাৎ পাত্রীর চোখ আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠল। কিন্তু আমার হবু তার কানে কানে কিছু বলে বিস্ফোরণটা চেপে রাখার চেষ্টা করল।

আর সুধীরবাবু ভারী কাঁচুমাচু হয়ে আমাকে বার দুই নমস্কার করলেন। পাত্রীর দিকে এক বারও তাকালেন না। যেন আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন, এমন ভাব করে আমতা আমতা করে নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা পেড়ে ফেললেন, আপনারা শহরের লোক, কত জানেন-শোনেন। আমরা গাঁয়ে কোন অন্ধকারে পড়ে আছি। তার পর বোধহয় ফসলের পোকা, গরুর অসুখ, মাকালতলার শিবরাত্রির মেলা— এমন সব আগডুম বাগডুম। ভারী মায়া হল আমার। নানা কথার আড়ালে উনি নিজেকে এবং নিজের বয়সটাকে আড়াল করতে চাইছিলেন বোধহয়। পাত্রী দেখার কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। ঘটকী হঠাৎ হুংকার দিল, বলি পাত্রী দেখতে এয়েছ, না কি?

সুধীরবাবু ভারী লজ্জিত হয়ে বললেন, ও আর কী দেখার আছে? আমি কি আর একটা মনিষ্যির মতো মনিষ্যি? আবার তিনি আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কখন দুজনের হাতে মিষ্টির প্লেট ধরানো হয়েছিল কে জানে। আমরা কথা কইতে কইতে দুজনেই বেবাক মিষ্টি সাবাড় করে ফেললাম। সত্যি বলতে কী, সুধীরবাবুকে আমার বেশ লাগল। অমায়িক, বিনয়ী, নিরহংকার, মিষ্টভাষী এবং সম্ভবত সজ্জন।

সুধীর চলে যাওয়ার পর বকুল রাগ করে কেঁদেকেটে একশা। আমার হবুও ঘটকীকে খুব ঝাড় দিল। কিন্তু আমার মনে হল, বিয়েটা হলেও তো হয়। কথাটা প্রকাশ করায় হবু আমার সঙ্গে দু'ঘণ্টা কথা বন্ধ রেখেছিল।

যত দূর খবর পেয়েছি, বিয়েটা কিন্তু হয়েছিল। এবং বেশ টেকসইও হয়েছিল।

টাকের ওপর সটান খাড়া শরীর

কাটিহারে আমরা ছিলাম তিন-চার বছর। কিন্তু ওই সময়েই আমি যত বিচিত্র ও বিশেষ মানুষকে দেখেছি, তেমনটা আর কোথাও দেখিনি। পূর্ণিয়ার দাতাবাবা, আমেরিকান সন্ন্যাসী, তন্ত্রসাধক, যুদ্ধফেরত বাঙালি সোলজার এবং এই রকম বহু। আমার বাবা একাধারে অতীব সুপুরুষ, টেনিস এবং ক্রিকেট খেলোয়াড়, এক জন ভাল গায়ক এবং দক্ষ অফিসার। সেই সুবাদে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই গানের আসর বসত। তাতে নরেন্দ্রনাথ চন্দ্র নামে এক জন আসতেন, ওস্তাদি গানে যিনি ছিলেন খুবই দড়। তিনিই এক বার বিখ্যাত গায়ক-নায়ক রবীন মজুমদারকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির করেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি ততটা বিখ্যাত হননি। দিন দুই আমাদের বাড়িতে গানের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগই রাগপ্রধান, ঠুংরি আর গজল। আর সেই আসরে এসে এক জন মানুষ মাঝে মাঝে শ্যামাসংগীত গাইতেন। তিনি ছিলেন ডিটিএস সাহেব সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই শিবু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিবুকাকুকে সবাই জানত মাথাপাগলা লোক। খুব ফরসা, সামান্য মেদযুক্ত চেহারা, মাথাজোড়া টাক। শিবুকাকুর বয়স যে খুব বেশি ছিল তা নয়। বড়জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। তাঁর সম্পর্কে কাটিহারে অনেক রটনা ছিল। তিনি কালীসাধক, মারণ উচাটন বশীকরণ জানেন, সাধনায় বসে তিনি মাটি থেকে তিন-চার হাত শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন— এই রকম নানাবিধ কথা। এমনিতে মানুষটা ভারী হাসিখুশি, ধুতি আর শার্ট ছিল তাঁর মার্কামারা পোশাক। প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। আমার মায়ের হাতের লুচি-তরকারি বা পরোটা খেতেন যত্ন করে। আমাদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতেও নেমে পড়তেন।

ডিটিএস তখন একটি বিশেষ রাশভারী পদ। তখনকার ব্রিটিশ আমলে ওই পদে সাহেবসুবোই বেশি থাকত। বাঙালি বা ভারতীয় কম। সুতরাং সুধীরবাবুর বেশ খাতির ছিল। কিন্তু শিবুকাকাকে নিয়ে তাঁর একটু সমস্যা ছিল। অমন এক জন মান্যগণ্য মানুষের ভাই কিনা যত্রতত্র টো-টো করে ঘুরে বেড়ান। খালাসি, খানসামা, বাদামওলা, ধোপা, নাপিত, মুচি, এমনকী ভিখিরিদের সঙ্গেও তাঁর অগাধ মেলামেশা। শিবুকাকা চাকরি করতেন না, সুতরাং রোজগার নেই। কালীসাধনা করা ছাড়া অন্য কোনও উচ্চাশাও তাঁর ছিল না। বিয়ে করার কথায় আঁতকে উঠতেন।

শিবুকাকা সম্পর্কে দু'ধরনের রটনা ছিল। গরিবগুরবো, সাধারণ মানুষেরা বলত শিবুকাকু এক জন মস্ত সাধু। তিনি মড়া বাঁচাতে পারেন। আর বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষেরা মনে করত, শিবুকাকু এক জন ভণ্ড।

তবে তাঁকে অগ্রাহ্য বড় কেউ একটা করত না।

শিবুকাকু গানটান বিশেষ শেখেননি। কিন্তু যখন তিনি শ্যামাসংগীত গাইতেন, তখন কিন্তু অনেকের চোখে জল আসত।

আমরা ছোটরা অবশ্য শিবুকাকুকে খুবই পছন্দ করতাম। আমাদের সঙ্গে তিনি আমাদের বয়সি হয়েই যেন মিশতেন। আবদার করলে মেটাতেন, লজেন্স দিতেন। আমাদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে পোড়া ভুট্টা, বাদামভাজা বা বুড়ির মাথার পাকা চুল খেতেন। আর শোনাতেন ভূতপ্রেত বা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প। আমরা সম্মোহিত হয়ে যেতাম।

মহিলাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার মতো বয়স তখন আমাদের নয়। আমাদের কাছে তখন ওই বয়সি মেয়েরা ছিঁচকাঁদুনে, নালশেকুটি, ঝগড়ুটে ছাড়া কিছু নয়। তাই যখন শুনলাম, কালীসাধক হওয়ার আগে শিবুকাকু একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন, এবং প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কালীসাধনার পথ ধরেন, তখন ভারী রাগ হয়েছিল। এহ্ মা, একটা মেয়ের জন্য? দূর! একটা মেয়ের জন্য কেউ ফিদা হয়ে যায় নাকি?

তখন অবশ্য প্রেম বলতে মাখামাখি তো নয়ই, এমনকী বাক্যালাপও হত না। বড়জোর চোখাচোখি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে মহিলার জন্য চিরকুমার ছিলেন, তার সঙ্গেও তাঁর মাত্র কয়েক দিনের চোখাচোখির সম্পর্ক ছিল মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। মনে মনে প্রেম যে উচ্চারিত প্রেমের চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী তা এখন একটু একটু বুঝতে পারি।

একটা জিনিস লক্ষ করতাম। শিবুকাকু যখন বড়দের আসরে বসতেন, তখন তাঁকে লক্ষ করে নানা রকম ঠাট্টা-তামাশা করা হত, টিটকিরি দেওয়া হত। কিন্তু কখনও শিবুকাকুকে উত্তেজিত হতে বা রেগে যেতে দেখিনি। মুখে সর্বদাই সেই সহজ এবং সরল একটা হাসি। সেটা প্রতিবাদ না অনুমোদন, তা-ও বোঝা যেত না।

এক দিন ছুটির সকালে আমাদের বাংলো বাড়িতে কয়েক জন এসেছেন। শিবুকাকুও উপস্থিত। এবং যথারীতি হাসি-মশকরাও হচ্ছে। কে যেন বললেন, ও হে শিবু, তুমি তো দারুণ শীর্ষাসন করতে পারো। দেখাও তো বাপু!

শিবুকাকু হাসিমুখেই বললেন, দেখবেন?

তার পরই অবিশ্বাস্য সেই কাণ্ড! বারান্দার মেঝের ওপর শিবুকাকু উবু হয়ে বসে হাতের ভর দিয়ে শীর্ষাসন করলেন, কিন্তু হাতের সাপোর্ট ছাড়া। দুটি হাত বুকে জড়ো করা, শুধু টাকের ওপর শরীরটা সটান খাড়া হয়ে আছে। পা ওপরে, মাথা নীচে, চোখ বোজা। তা-ও এক মিনিট, দু-মিনিট নয়, ওই রকম নিরালম্ব

হয়ে তিনি স্থির হয়ে রইলেন। সময়ের হিসেব ছিল না। চেঁচামেচি হল। তাঁকে নামানো হল। দেখা গেল বাহ্যজ্ঞান নেই।

আজ অবধি ওই আশ্চর্য শীর্ষাসন আমি কখনও দেখিনি। এর পর থেকে শিবুকাকুকে সবাই সমঝে চলত।

পায়ে আশি টাকার জুতো!

১৯৪২-৪৩ সালে আশি টাকা এখনকার কত টাকা হবে, তা আমার জানা নেই বটে, কিন্তু এটা জানি যে, তখন কাটিহারে এক সের (কেজি নয়) মাংসের দাম ছিল আট আনা। বড় একটি পেতলের কলসি ভরা ভাগলপুরি গরুর দুধ এক টাকা। এবং আমার বাবা এক জন প্রবলপ্রতাপ টি আই হিসেবে রেল থেকে একশো বা সোয়াশো টাকা বেতন পেতেন। এবং সেটা অনেকের মতে বেশ মোটা বেতন। আর এটাও আবছা স্মরণে আছে যে, আমাদের দৈনিক বাজারের খরচ এক টাকা পাঁচ সিকের বেশি ছিল না। আমি আবার ততটা গবেট নই যে, এই পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করে বলব যে, সেই আমলটা খুব সস্তার আমল ছিল। টাকার অবমূল্যায়ন নানা কারণেই হয়। তাতে 'তখন সস্তা ছিল, এখন আক্রা' এমনটা মনে করার কারণ নেই।

যাই হোক, বিশুমামার এই কাহিনিতে এই বাজারদরের একটা ভূমিকা আছে। বিশুমামা ছিলেন অকৃতদার, আমার মায়ের চেয়ে পাঁচ-ছ'বছরের ছোট এবং ছিলেন লালমণিরহাট স্টেশনের রেলের ইয়ার্ড মাস্টার। আমার মামারা প্রায় সকলেই ভিতু প্রকৃতির মানুষ, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলেন। আমি জেনেটিক্যালি মামাদের ভিতু স্বভাবটিই পেয়েছি। আমার আট জন মামার মধ্যে রামমামা, নিরুমামা আর জিষ্ণুমামাই যা একটু ডাকাবুকো ছিলেন। বিশুমামা মাঝেমধ্যেই কাটিহারে চলে আসতেন তাঁর মেজদি, অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে। আমার মামারা প্রায় সকলেই ভালমানুষ গোছের, বিষয়বুদ্ধিহীন, একটু বেশিই সোজা-সরল। ফলে দাদামশাইয়ের রেখে যাওয়া বিশাল বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

বিশুমামার আরও একটা ব্যাপার ছিল। মা বা ভাই-বোন— কারও মৃত্যুসংবাদ সহ্য করতে পারবেন না বলে তিনি কারও সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন না। শুধু আমাদের সঙ্গেই রাখতেন, তা-ও রেলতুতো সম্পর্কটা ছিল বলেই।

বিশুমামা আমার অন্যান্য মামার মতোই বাবুগিরির ধার ধারতেন না। কাজের সময় রেলের পোশাক পরতেন, বাকি সময় ধুতি আর জামা। পায়ে একজোড়া সস্তা চপ্পল। যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, তখন ভাগ্নে-ভাগ্নিদের জন্য নিয়ে আসতেন সস্তার মিলিটারি বিস্কুট। মিলিটারিদের জন্য তৈরি সেই সব মোটা মোটা বিস্বাদ বিস্কুট মিলিটারিরাও খেত কি না, সন্দেহ।

এক বার বিশুমামা এমন কাণ্ড করলেন যে, গোটা কাটিহার চমকে গেল। ভোরবেলা বিশুমামা এসেছেন। পরনে সেই মলিন ধুতি আর জামা, কিন্তু দু'পায়ে চকচক করছে এক জোড়া নতুন বুটজুতো। সেই জুতো দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। কেন না, মামা কবুল করলেন সেই জুতোজোড়ার দাম নাকি আশি টাকা। শুনে মায়ের তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মায়ের যে কী বকুনি মামাকে! তোর আক্কেলটা কী বল তো? এমনিতে তো কাছাকোঁচার ঠিক নেই, ন্যালাখ্যাপা মানুষ। অত দামি জুতো কিনলি কার বুদ্ধিতে? ও তো চোরে-ডাকাতে কেড়ে নেবে। আমার বাবা কাঠবাঙাল। লাইন থেকে ফিরে ঘটনা শুনে এবং জুতো দেখে তাঁরও চোখ কপালে, এইটা করছস কী রে বিশ্বনাথ? পেটেন্ট লেদারের বিলাতি জুতা পায়ে পইরা ঘুরতাছস? তাও ধুতি আর জামার লগে! তর অবস্থা তো দ্যাখতাছি, সর্বাঙ্গে উড়ে খৈল মাগ্গে মাখে বিষ্ণুতৈল!

আশি টাকার জুতোর কথা যে-ই শোনে, সে-ই তাজ্জব হয়ে যায়। আমাদের বাংলোয় বাবার দেওয়া এক পার্টিতে বড় এক রেলের অফিসারের বউ একশো টাকা দামের শাড়ি পরে এসেছিলেন, যা দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। সেইটেই আমার দেখা একটা দামি জিনিস। তার পরই বিশুমামার জুতো।

মামা অবশ্য জুতোর গৌরবে খুব একটা গৌরবান্বিত নন। বরং তাঁকে খানিকটা তটস্থ আর অপ্রতিভই দেখাচ্ছিল। কোনও এক বিলিতি জুতোর দোকানে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলেছেন। কেনার পর বোধহয় তাঁর মনস্তাপও হচ্ছিল। কিন্তু সাহেবপাড়া থেকে ঝেঁটিয়ে লোক আসতে লাগল আশি টাকা দামের জুতো দেখার জন্য। আমি আমার বন্ধুদের ডেকে আনলাম। সুতরাং বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। আমি তখন প্রবল উত্তেজিত। কারণ মামা আমার, সুতরাং তাঁর জুতোর ওপর আমারও যেন আংশিক অধিকার।

তবে নিরপেক্ষ বিচারে জুতোজোড়ার তেমন আলাদা বৈশিষ্ট্য বা বাহার ছিল না। আর পাঁচটা জুতোর মতোই। একটু চকচকে, এই যা। সে বার যে ক'দিন মামা আমাদের বাড়িতে ছিলেন, জুতোজোড়াকে দ্রষ্টব্য হিসেবে তোলা তোলা করে রাখা হল।

এর পরের বার মামা যখন এলেন, তখন দেখি সেই দামি জুতো অনেকটাই মলিন, জেল্লা উধাও। মামা বললেন, কী করব বল? ইয়ার্ডে ধুলো-কাদায় ঘুরে ডিউটি করতে হয়। পরের বার যখন আবার এলেন, তখন আশি টাকার জুতো মহিমা হারিয়েছে। ছাল উঠে গেছে। পালিশ হয়নি বহু দিন, সোল ক্ষয়ে গেছে অনেকটা। ক্রমে ক্রমে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে হয়ে জুতোজোড়া বছরখানেকের মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেল।

অঙ্ক ক্লাসের চার্লি চ্যাপলিন

স্যরদের খ্যাপানোর নাম দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বহু পুরনো ট্র্যাডিশন। তবে সব স্যর নন, যাঁরা একটু বাতিকগ্রস্ত, রাগী বা গম্ভীর, বা যাঁদের কোনও মুদ্রাদোষ আছে, তাঁদেরই আদর করে নাম দেওয়া হয়। আর এই নাম এক বার দেওয়া হলে সেই নাম বছরের পর বছর পরম্পরায় চলতে থাকে, আর বদলায় না। নাম দেওয়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অদ্ভুত উদ্ভাবনী বুদ্ধিরও পরিচয় থাকে।

যখন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি হয়েছিলাম, তখন আমি সদ্য-কিশোর। থাকতাম স্কুল চত্বরের মধ্যেই হোস্টেলে। আর একটু কম বয়সে আমি যে প্রচণ্ড দুষ্টু ছিলাম, সেই দুষ্টুমি তখন অনেকটাই প্রশমিত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, দুষ্টুমি আমাকে পুরোপুরি কখনও ছেড়ে যায়নি। তার কিছু রেশ এখনও আমার মধ্যে আছে।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কিছু দিন মুখচোরা ভাবটা ছিল। তার পরই আমি স্বমূর্তিতে প্রকাশ হলাম। তবে আমার দুষ্টুমি তখন খেলার মাঠে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবলে যত অনুরাগ, লেখাপড়ায় তার কণামাত্র নয়। তবু পরীক্ষার আগে মাসখানেক পড়লেই অঙ্ক বাদে অন্য বিষয়ে ভদ্রস্থ নম্বর পেয়ে যেতাম। অঙ্ক চল্লিশের ঘরের বেশি এগোত না।

আমাদের ইতিহাসের বসন্তবাবুকে ছেলেরা বলত গোরিলা স্যর। খুবই অন্যায্য নাম। কারণ বসন্তবাবু রোগা, লম্বা, ফরসা মানুষ। গোরিলার সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। কিন্তু অঙ্কের স্যর কালীবাবুর নাম চার্লি অনেকটা যথাযথ। কালীবাবু নাতিদীর্ঘ, কালো, চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ। কিন্তু তাঁকে দেখে হাসি পেত না মোটেই। অঙ্ক-পাগল মানুষ ছিলেন। ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক লিখতে শুরু করতেন। রাগী বা রগচটা নন, কিন্তু খুব সিরিয়াস।

যখন হোস্টেলে থাকতাম, তখন ঘরে পরার জন্য হাওয়াই চটি আবিষ্কার হয়নি। আর আমাদেরও চটি কেনার মতো পয়সার জোর ছিল না। আমরা সবাই তখন সস্তার খড়ম কিনে ঘরে পরতাম। স্ট্র্যাপ লাগানো খড়ম দিব্যি জিনিস। লয়ক্ষয় নেই, বহু দিন পরা যেত। দোষের মধ্যে একটু খটাং খটাং শব্দ হত। স্কুল চত্বরে থাকতাম বলেই ক্লাসে যেতাম একদম শেষ মুহূর্তে এবং ঘরে পরার খড়ম পায়ে দিয়েই। ধরা পড়লে অবশ্য মুশকিল ছিল।

সে দিন প্রথমেই কালীবাবুর ক্লাস। উনি ক্লাসে এসে সবে ঢুকেছেন, হঠাৎ কেন কে জানে, আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধির উদয় হল। আমি হঠাৎ পায়ের খড়ম-জোড়া দিয়ে খটাখট খটাখট কয়েক বার শব্দ করলাম।

এই বেআদবিতে কালীবাবু ভীষণ চটে গিয়ে 'কে শব্দ করল? কে খড়ম পরে এসেছে?' বলে উত্তেজিত ভাবে পোডিয়াম থেকে নেমে এলেন। আমার ঠিক পিছনেই বসেছিল সুকুমার। সে আমাকে বাঁচানোর জন্য চট করে নিচু হয়ে আমার খড়মদুটো পা থেকে খুলে নিয়ে দরজা দিয়ে ছুড়ে স্কুলের মাঠে ফেলে দিল।

ধরা পড়ল চিন্ময়। সে হোস্টেলে থাকত না, কী কুক্ষণে সে দিন ভুল করে খড়ম পরে চলে এসেছিল। সে যত বোঝানোর চেষ্টা করে, শব্দটা করেনি, কালীবাবু ততই রেগে যান। কেসটা হেডস্যরের কাছে যাওয়ার উপক্রম। আর হেডস্যর হলেন স্কুলের হৃৎকম্প।

ব্যাপারটা কাপুরুষোচিত হয়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে কবুল করলাম, আমিই অপরাধী। কিন্তু কালীবাবু আমার খালি পা দেখে কথাটা বিশ্বাস করলেন না। ঘটনাটা বিস্তারিত বলার পর রাগে আত্মহারা কালীবাবু কী করবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। খানিক পায়চারি করলেন, চক-ডাস্টার ছুড়ে ফেললেন, পোডিয়ামে বার কয়েক উঠলেন নামলেন। হুবহু চার্লি চ্যাপলিনের মতোই লাগছিল তাঁকে। অবশেষে অসহায় রাগে যে শাস্তিটা ঘোষণা করলেন তাও বড় করুণ। বললেন, খুব সাবধান! এর পর থেকে তোমার ওপর স্পেশাল নজর রাখা হবে।

টেস্ট পরীক্ষার অঙ্কে যথারীতি খুব খারাপ নম্বর। খেলাধূলায় ভাল ছিলাম বলে হেডস্যর সতীশ ভৌমিকের নেকনজরে ছিলাম। মার্কশিট দেখে আমাকে ডেকে থমথমে মুখে বললেন, ফাইনালে এ রকম নম্বর পেলে আগাপাছতলা বেত খাওয়ার জন্য তৈরি থাকিস। বাড়িতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বাবাকে যমের মতো ভয় পেতাম। গম্ভীর মুখে বললেন, হোস্টেলে গিয়া তো দেখি পাখনা গজাইছে।

বিপদ বুঝে এক দিন কালীবাবুর কাছে গিয়ে মিনমিন করে বললাম, স্যর, আমাকে পড়াবেন? আমাকে দেখে মোটেই খুশি হলেন না তিনি। একটু যেন সচকিত হয়ে বললেন, ওঃ তুমি?

খুশি না হলেও পড়াতে রাজি হলেন। তিনি স্কুলের পর ক্লাসরুমেই একসঙ্গে কয়েক জনকে পড়াতেন। শুধু অঙ্ক। আমরা যে যার হ্যারিকেন নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে অঙ্ক কষতাম। আর বলতে নেই, জীবনে সেই প্রথম বোধহয় অঙ্ক ব্যাপারটাকে আমি খানিকটা আস্বাদন করতে শুরু করি। বিশেষ করে অ্যালজেব্রা। তার ভিতরে যে মজাটা আছে কালীবাবু অত্যন্ত সহজে সেটা ধরিয়ে দিলেন। আর এমন তন্ময় হয়ে পড়াতেন এবং পড়াতে পড়াতে আবেগে উত্তেজিত হয়ে মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথার খেই হারিয়ে ফেলতেন যে আমার লোকটাকে দেখে অবাক লাগত। অঙ্কের মদিরা আকণ্ঠ পান করা এক জন মানুষ! তিনি কাউকে পাশ করিয়ে

দেওয়ার জন্য পড়াতেন না। ও সব তাঁর মাথাতেই ছিল না। তিনি শুধু অঙ্কের রূপকথার রাজ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

মাত্র মাস দুই তাঁর কাছে অঙ্ক শিখেছিলাম। আর তাতেই স্কুল ফাইনালের চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমার অঙ্কের নম্বর অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সামান্য বেতনের এক জন স্কুলশিক্ষক ছিলেন বটে, তেমন সফল কোনও মানুষও নন। তবু কালীবাবুকে আমার এক জন ক্ষণজন্মা মানুষ বলে মনে হয়। তাঁর জন্যই অঙ্ককে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি।

পাগল মা-ই যেন তার মেয়ে

আমার কৈশোর-যৌবন কেটেছে বাড়ি-ছাড়া হয়ে, হোস্টেল, বোর্ডিং এবং মেস-এ। প্রায় কুড়ি-একুশ বছর। তবে মা আর বাড়ির টানে বছরে দু'বার, গ্রীষ্মে আর পুজোয় বাড়ি যাওয়া চাই। নানা ঠাঁই ঘুরে ১৯৫৪-৫৫-তে আমরা শিলিগুড়িতে থিতু হই। বাড়িতে এসোজন-বসোজনের অভাব ছিল না। দূর, অতি-দূর আত্মীয়তার সূত্রেও কত লোক যে আসত! আর বাঙাল ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, তাদের আপ্যায়নও করতে হত। ভিখিরিকে শুধু-হাতে ফেরানো হত না কখনওই। আমার মায়ের বাৎসল্য আবার একটু বেশি।

এক বার পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে দেখি, বাড়িতে এক জন নতুন কাজের লোক বহাল হয়েছে। মাঝবয়সি এক মহিলা। সঙ্গে সাত-আট বছর বয়সি তার ছেলে। নিরাশ্রয় হয়ে দিনের পর দিন শিলিগুড়ি রেলস্টেশনে বসে থাকত। আমার মা দৃশ্যটা দেখে এক দিন তাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। মহিলার নাম যমুনা। ছেলে বাসু। মা আমাকে আড়ালে বললেন, যমুনা নাকি পাগল। সব সময় পাগলামি থাকে না। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো জেগে ওঠে।

তবে এমনিতে যমুনা খুব চুপচাপ। আপনমনে কাজ করে। গুনগুন করে একটু গানও গায়। চেহারায় অতীতের সম্পন্নতার একটু ছাপ আছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আত্মীয়রা তাড়িয়ে দিয়েছে বলে শোনা যায়।

কিন্তু আমি চমৎকৃত হই বাসুকে দেখে। অতটুকু ছেলে, যেমন তার বুদ্ধি, তেমন গুণপনা। চমৎকার গান গাইতে পারত, ছবি আঁকতে পারত এবং ভীষণ ভাল পারত দুর্গাপূজার সময় আরতি করতে। সেলাই জানত, উল বুনতে পারত এবং অসম্ভব পরিশ্রমী। বাসু আসায় আমাদের বাড়িতে যেন নতুন একটা প্রাণচঞ্চলতা এল। ওই বয়সেই বিভিন্ন প্যান্ডালে আরতি কম্পিটিশনে আরতি করে সে গাদা গাদা প্রাইজ নিয়ে এল। আমার বোনের কাছে গান শিখত। হারমোনিয়ম বাজানো শিখতে তার লহমাও দেরি হয়নি। বেশ ছিল মায়ে-পোয়ে মিলে।

কিন্তু হঠাৎই এক দিন যমুনার পাগলামি দেখা দিল। তেমন ভায়োলেন্ট কিছু নয়। নানা অসংলগ্ন কথা আর উলটোপালটা কাজ। আমি খুব মন দিয়ে তার প্রলাপ শুনে ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝতে চেষ্টা করতাম। যমুনা নিশিদারোগার কথা খুব বলত। সে যে কে, বা কী বৃত্তান্ত তা জানি না। আর বলত, হ হ, কত দিছি থুইছি খাওয়াইছি, কত আইছে গেছে, কত লেনদেন। আবার কাকে যেন শাপশাপান্তও করত। বকবকানি চলত দিন-রাত, কখনও তারস্বরে।

বাসু বুঝতে পারত, মা এ রকম করলে তাদের কোথাও আশ্রয় পাওয়া কঠিন। সে মাকে চুপ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করত। তার মুখেই শুনেছি, যমুনার পাগলামির জন্য কোনও বাড়িতেই তারা টিকতে পারে না।

এর পর যমুনা আর বাসু বিদায় নিয়ে আবার স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নিল। তার পর কোথায় গেল, কে জানে। কিন্তু মাসখানেক পরে আবার ফিরে এল তারা। যমুনা শান্ত, বাসুর মুখে হাসি। কিন্তু দেখেছি, পাগল মা'কে কত ভাবে আগলে রাখত বাসু। মাঝে মাঝে মনে হত, সে যেন বাবা, আর যমুনা তার মেয়ে।

এই ভাবেই যমুনা আর বাসু ক্রমে ক্রমে আমাদের বড্ড আপনজন হয়ে উঠল। বাসু বড় হতে লাগল। আরতি করে, গান গেয়ে, হাতের কাজ করে তার আলাদা রকমের একটা খ্যাতিও হল। চমৎকার রান্নাও করতে পারত সে। আমার ভাই আর বোনের কাছেই যা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। স্কুলেও যেত। তবে সেটা বেশি দূর টানতে পারেনি মায়ের জন্য। কিন্তু ঠিকমত লেখাপড়া করলে এই মেধাবী ছেলেটি লেখাপড়াতেও খুব ভাল কিছু করতে পারত।

চোখের সামনে অবিশ্বাস্য যেটা দেখলাম তা হল, দুঃখী, পাগল মাকে রক্ষা করার জন্যই যেন বাসু খুব তাড়াতাড়ি সাবালক হয়ে উঠতে লাগল। যেমন চালাকচতুর, তেমনই বিবেচনাশক্তি, তেমনই অমলিন তার হাসি এবং রসবোধ। ওই বয়সে ছেলেরা নানা কুসঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ করে, খারাপ কথা বলে। বাসু সে দিক দিয়ে নিষ্কলঙ্ক। কোনও দিন তার আচরণে বেচাল কিছু ধরা পড়েনি। কখনও মেজাজ হারাত না। কারও সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়ায় যেত না।

প্রায় পনেরো-ষোলো বছর তারা দুটিতে ঘুরেফিরে আমাদের বাড়িতে থেকেছে। তার পর বাসু তার নিজের গুণপনার জন্যই কারও সুপারিশে তিস্তা ব্যারেজে চাকরি পেয়ে গেল। বাসা ভাড়া করে মাকে নিয়ে গেল নিজের কাছে। সেই বাসায় আমার মা, বোন, ভাই সবাই গেছে। দেখেছে, মা'কে কী যত্ন করে রেখেছে বাসু। ডাক্তার দেখায়, নিজের হাতে ওষুধ খাওয়ায়, দরকারে খাইয়ে দেয়। বাসুর সব কৃতিত্বের উৎসই বোধহয় তার ওই মাতৃভক্তি। মায়ের পাগলামির জন্য অনেক ভুগতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কখনও বিরক্ত হয়নি।

এর পর বাসুর বিয়ে হয়। দুটি মেয়ে জন্মায়। বাসু বাড়িও করেছে। প্রোমোশন পেয়ে পেয়ে তার এখন সচ্ছল অবস্থা। তার মেয়ে মাধ্যমিক থেকে এমএ পর্যন্ত দুর্দান্ত ফল করে ভাল চাকরি করছে। ছোট মেয়েটি স্কুলের অতি কৃতী ছাত্রী।

যমুনা আর নেই। কিন্তু তার বাসু আছে। পাগল মায়ের যত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান সব মুছে দিয়েছে সে। বাবা-মায়েদের এই দুঃসময়ে বাসুর কথা ভাবলে মনটা ভাল হয়ে যায়।

‘কবীন্দ্র রবীন্দ্র... বুঝলেন কিনা’

সুপ্রিয়মামা আমার নিজের মামা নন। জেঠিমার ভাই। কিন্তু আত্মীয়তার দূরত্ব থাকলেও কখনও-সখনও সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই মামার সঙ্গে আমাদেরও তা-ই হয়েছিল। ভারী সিধেসাদা লোক, অতিশয় সরল, কোনও ঘোরপ্যাঁচ ছিল না তাঁর। যখন আমরা ময়মনসিংহে এবং খুবই ছোট, তখন থেকেই মামা মাঝে মাঝে এসে হাজির হতেন। সুপ্রিয়মামাকে আমাদের বেশ পছন্দ ছিল। রেলে কাজ করতেন এবং সেই সূত্রেই ইন্সপেকশন-এর কাজে ময়মনসিংহে আসতেন। দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল পার্টিশনের কিছু আগে। মামা ময়মনসিংহ থেকে ফেরার সময় ট্রেনে ভয়ংকর অ্যাকসিডেন্ট হয়। বহু মানুষ মারা যায়। সুপ্রিয়মামা গভীর রাতের সেই অ্যাকসিডেন্টে কামরার ভাঙা অংশের সঙ্গে বহু দূর ছিটকে পড়েন। অতি সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তার পর ছাড়া পান। তেমন কোনও গুরুতর অঙ্গহানি হয়নি। শুধু জিবটা কাটা পড়েছিল। সেটা জোড়াও লাগানো হয়। বাকি জীবন ওই জিব নিয়েই যা সমস্যা ছিল। জিবটা সব সময় কাঁপত এবং কথা একটু একটু এড়িয়ে যেত।

রেলের সম্পর্কসূত্রে সেই মামা কালক্রমে শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এলেন। রেল কোয়ার্টার্স কাছাকাছিই। ফলে দু’বাড়িতে রোজ যাতায়াত। মামিও নির্ভেজাল ভাল মানুষ। গেলেই কিছু না কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না।

সে দিন সকালে আমার ভাই বাজারে গিয়ে দামি পাইলট পেনটা হারিয়ে এল। খুব মন খারাপ। একটু বেলায় সে মামার বাড়িতে গিয়েছিল, যেমন প্রায়ই যায়। মামার মেজো ছেলে তার সমবয়সি এবং বন্ধু। গিয়ে দেখে মামাবাড়িতে একটা হই-হুল্লোড় হচ্ছে। কারণটা হল, মামা সে দিন বাজারে গিয়ে একটা পাইলট পেন কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেটাই সেলিব্রেট করা হচ্ছে। সেই আনন্দের পরিবেশে আমার ভাই মুখ চুন করে জানাল যে, পেনটা তারই। এতে আনন্দটা দপ করে নিভে গেল বটে, কিন্তু মামা এমন হাবভাব করতে লাগলেন যে, এতে তাঁরই যেন অপরাধ হয়েছে। ভারী অপ্রতিভ, বিব্রত।

মামার এক ছেলে গান লিখত। একটু-আধটু গাইতও। ব্যাপারটা মামার বিশেষ পছন্দ ছিল না। আমাকে বলতেন, মনায় ওই সব ছাইভস্ম লেইখ্যা ল্যাখাপড়ার বারোটা বাজাইতাছে। অরে একটু বুঝাইয়া কইয়ো তো! গানগুন লেইখ্যা কী হয়? এই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় একটু সম্পর্কের টানাপড়েনও ছিল।

মনা এক বার কিছু গান লিখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয় গোপনে। কিছু দিন পরে হঠাৎ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নিজের হাতে লেখা চিঠি এসে হাজির। তাতে তিনি মনাকে গান লিখতে উৎসাহই দিয়েছেন। নিজের একটা ছবিও পাঠিয়েছেন।

মফস্‌সল শহরে একটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চিঠি আসা যে কত বড় ঘটনা, তা আমি জানি। সুতরাং মামার বাড়িতে হইহই পড়ে গেল। মামার মুখে সে কী উজ্জ্বল অহংকারের হাসি! আমাকে ডেকে বললেন, বোঝলা রুণু, হ্যামন্ত মুখার্জির চিঠি আইছে। কত বড় কথা কও দেখি!

বলা বাহুল্য, এর পর আর মনার গান লেখার বাধা হল না।

কালিম্পংয়ের এক বুড়ি মিশনারি মেমসাহেবের ট্রেনে কিছু টাকাপয়সা আর জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছিল। সাধারণত রেলের এ সব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইনি বিদেশিনি বলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয়। সেই চেকটা মেমসাহেবকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার বাবা যাবেন। সেই তক্কে বাবার স্টেশন ওয়াগনে আমি আর সুপ্রিয়মামাও সওয়ার হয়ে গেলাম। বুড়ি তো চেক পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। এর পর বাবা গেলেন মিটিংয়ে। আমি আর মামা বেরিয়ে পড়লাম রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখব বলে।

বাড়ির নাম চিত্রভানু। বেশ বড় বাগান। তার মাঝখানে চমৎকার বাংলো বাড়ি। সে দিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। কুয়াশা এবং মেঘও ছিল। সুপ্রিয়মামা রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখে এমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে, আবেগে চোখে জল এসে গেল। কাটা জিবের দরুন মামা একটু তাড়াতাড়ি কথা বলতেন, সবটা ভাল বোঝা যেত না। আবেগ হলে আরও অস্পষ্ট হয়ে যেত।

বাড়ির ফটকের ভিতর ঢোকা উচিত হবে কি না, বুঝতে পারছিলাম না। তাই বাইরে দাঁড়িয়েই ভেতরটা দেখছিলাম। এমন সময় দেখলাম, বারান্দার আবছায়ায় এক ভদ্রমহিলা বেতের চেয়ারে বসে। পাশে এক জন দাসী গোছের মেয়ে। ভদ্রমহিলার ইশারায় সেই মেয়েটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কাকে চাইছেন?

মামা উত্তেজিত। আবেগমথিত গলায় বলার চেষ্টা করলেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্র... বুঝলেন কিনা... রবীন্দ্র কবীন্দ্র... আমাগো বিশ্বকবি...

হ্যাঁ, এটাই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি।

বারান্দায় যিনি বসেছিলেন, তিনি উঠে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। প্রতিমা দেবীকে সেই আমার প্রথম দেখা। কী রূপ ওই বয়সেও! হেসে বললেন, আসুন না, ভিতরে আসুন। ঘুরে দেখুন।

এই আপ্যায়নে মামা এত বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন, আর কথাই বলতে পারেননি। চোখের জল মুছেছিলেন। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বার বার শুধু বলছিলেন, কী সৌভাগ্য হে! কী সৌভাগ্য!

শনিবারে কালো কুকুরকে লুচি

জন্মাবধি শুনে আসছি আমার নাকি শনির দশা। তার ওপর দুশ্চিন্তার বিষয় হল, আমার জন্মও হয়েছিল শনিবারে। ফলে, তাঁর বড় ছেলেটিকে নিয়ে মায়ের ছিল স্থায়ী এক দুশ্চিন্তা। দুষ্ট শনি কখন ছেলের কোন বিপদ ডেকে আনে, সেই চিন্তায় তাঁর দিন-রাত কাটত। আমার দিকে মা মাঝে মাঝেই জুলজুল করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। হয়তো ভাবতেন, ছেলেটা কি বাঁচবে? তাই বরাবর আমিই ছিলাম আমার মায়ের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। শনির হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য মা যে কত কী করতেন, তার লেখাজোখা নেই। আর মায়ের কল্যাণে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারের সবাই ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল। চাউর হয়ে গিয়েছিল পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যেও। সবাই জানত, রুণুর শনির দশা। আর তাই আকাশে মেঘ দেখলেই ঠাকুমা আমাকে ঢেকেঢুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, মাটিতে নামাতেন না। এই সব দেখেশুনে একটু বড় হয়ে আমারও ধারণা হয়েছিল, আমার দুনিয়াদারি বেশি দিনের নয়। শনি ঠাকুর আড়ায় আড়ায় ঘুরছেন। তক্কে তক্কে আছেন। এক দিন ছোঁ মেরে তুলে নেবেন।

আমাদের বাড়িতে বরাবরই সাধুসজ্জন এবং জ্যোতিষীদের আনাগোনা। ময়মনসিংহের বাড়িতে যেমন, পরে আমাদের বিভিন্ন জায়গার রেলের বাংলোতেও তেমন। কত রকমের সাধু যে আসতেন, তার হিসেব নেই। তেমনই আসতেন জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ফকির। অনেকে দু-চার দিনের আতিথ্যও নিতেন। সাধু-সেবায় মায়ের ক্লান্তি ছিল না। আমার যে ফাঁড়া আছে, সে বিষয়ে জ্যোতিষীরা প্রায় সবাই ছিলেন একমত। তাঁরা নানা বিচিত্র নিদান দিয়ে যেতেন এবং সেগুলো অভ্রান্ত ভাবে পালন করতেন মা। কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে রক্তাম্বর, জটাধারী এক ভয়ংকর ভোজপুরি সাধু আমার হাত দেখে যে নিদান দিয়েছিলেন, তা ছিল ভারী কঠিন। প্রতি শনিবারে সরষের তেলে একটা আটার লুচি ভেজে, তাতে একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে আমাকে সেটা বাঁ হাতে ধরে একটা কালো কুকুরকে খাওয়াতে হবে। শনিবারে মা তো লুচি ভেজে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে আমাদের বাচ্চা চাকর টুনটুনিয়াকে পাঠিয়েছেন রাস্তা থেকে একটা কালো কুকুর ধরে আনতে। অনেক ক্ষণ পর টুনটুনিয়া নারকোলের দড়িতে বেঁধে একটা কালো কুকুরকে এনে আমগাছের সঙ্গে বাঁধল। কিন্তু সে লুচি খাবে কী, কেঁউকেঁউ করে এমন লাফালাফি করতে লাগল যে বলার নয়। শেষ পর্যন্ত লুচিটা তার সামনে ফেলে চলে আসতে হল। খেয়েছিল কি না কে জানে।

আমি আদ্যন্ত মায়ের ছেলে। মা ছাড়া আমার দুনিয়া অন্ধকার। দিনের মধ্যে যে কত বার খেলা ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে মায়ের গায়ের গন্ধ শুঁকে আসতাম, তার হিসেব নেই। মাকে ছেড়ে থাকার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। কিন্তু কপালের ফের আর ঠেকাব কী করে?

আমার জীবনের সুস্পষ্ট দুটো ভাগ। দেশভাগের আগে, আর পরে। যে ভুক্তভোগী নয়, তার বোঝার সাধ্যই নেই যে, পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার বিষাদ কত গভীর হতে পারে। মুড়ির মোয়ার মতো আঁটবাঁধা একটা যৌথ পরিবার ছিল আমাদের। ডাক-খোঁজ ছিল, মায়া-বন্ধন ছিল, আত্মীয়তা কাকে বলে, তা আমরা জানতাম। একটা যৌথ পরিবারে বাস করলে মানুষ আপনা থেকেই শেখে ভাগ করে খেতে-শুতে। লোকে আমরা কয় ভাই-বোন জিজ্ঞেস করলে আমি আমার চার জ্যাঠতুতো দাদাকেও হিসেবে ধরে নিয়ে বলতাম। যেন একটা বোমা এসে পড়ল আর গোটা পরিবারটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে এক টুকরো, ওখানে এক টুকরো হয়ে গিয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে পর হয়ে গেল আপনজনেরা। আর মায়ের সঙ্গেও সেই থেকে একটু ছাড়াছাড়ি। বাবা অসমে, আমি আর দিদি জলপাইগুড়ির আত্মীয়বাড়ি।

পুজোর ছুটিতে লামডিঙে মায়ের কাছে এসেছি। সেই সময় আমার হল টাইফয়েড। কোনও চিকিৎসা নেই ওই রোগের। শুধু কিছু সহায়ক ওষুধ। আমাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। ঘোর জ্বরের আচ্ছন্নতায় শুধু দেখতে পেতাম মায়ের দুখানা করুণ আর ছলছলে চোখ। বাহান্ন দিন পর ভাত পথ্যি।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এক জ্যোতিষী। কানে শুনতেন না বলে সঙ্গে এক জন স্লেট-পেনসিলধারী অ্যাসিসট্যান্ট। কেউ প্রশ্ন করলে লোকটা স্লেটে লিখে দিত, সেটা দেখে জ্যোতিষী বিধান দিতেন। তিনি নাকি ছিলেন নেপালের রাজ-জ্যোতিষী। লামডিঙে তখন তাঁর প্রবল পসার। এক দিন বিকেলে আমি আমাদের বাংলোর বাঁধানো চাতালে খেলছি। জ্যোতিষী বারান্দায় বসে সবার সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ জ্যোতিষী আমাকে দেখিয়ে বাবাকে বললেন, আপকো ইয়ে লেড়কা তো মর জায়গা! শুনে বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কদাচিৎ বাবাকে এমন নার্ভাস হতে দেখেছি। বাবা কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন। জ্যোতিষী বললেন, ফাঁড়াটা কাটবার নয়। তবু তিনি একটা মাদুলি দেবেন। দাম কুড়ি টাকা।

তখনকার কুড়ি টাকা মানে কিন্তু অনেক টাকা। বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কয়েক দিন পর জ্যোতিষী মাদুলি এনে আমার ডান হাতে তাগা দিয়ে বেঁধে বলে দিলেন, কোনও নোংরা জায়গায় যাবে না। গেলে তাবিজ হাত থেকে ছিটকে যাবে।

তখন আমার বয়স বোধহয় এগারো বা বারো। তবু আমার কেন যেন জ্যোতিষীটাকে বিশ্বাস হত না। মনে হত ওর ওই কানে না শোনাটা একটা ভান। আসলে ভালই শোনে। অ্যাসিসট্যান্টটা খদ্দেরের সঙ্গে অবিরল

কথা বলে নানা খবর জেনে নেয়। সেই সব থেকেই জ্যোতিষী নানা কথা বলে দিতে পারে। একটি চতুর পরিকল্পনা।

আমার বয়সি আমার আর এক বন্ধুকেও অনুরূপ কবচ ওই জ্যোতিষী দিয়েছিলেন। আমার সেই বন্ধুটিরও জ্যোতিষীর ওপর বিশ্বাস ছিল না। বলত, লোকটা ভণ্ড।

লামডিঙের থানার মাঠে তখন আমরা ক্রিকেট খেলতাম। খেলার পর সন্ধে পর্যন্ত মাঠে বসে নানা গল্প হত। বন্ধুদের প্রায় সবার বাড়িতেই নেপালের রাজ-জ্যোতিষীর আনাগোনা ছিল। সেই সব নিয়েও আমাদের অনেক কথা হত। জ্যোতিষীর ভিকটিম অল্পবিস্তর সবাই।

তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে, জ্যোতিষীর মুখখানা ছিল ভারী ভালমানুষের মতো। খুব আস্তে কথা বলতেন। খুব বেশি বকবক করতেন না।

ক্রিকেট বল প্রায়ই মাঠের প্রান্তে ড্রেনে গিয়ে পড়ত। আমি বা আমার তাবিজওয়ালা বন্ধু ড্রেন থেকে বল তুলতাম না, বারণ আছে বলে। কিন্তু এক দিন বেখেয়ালে একটা ক্যাচ লুফতে গিয়ে আমার বন্ধুটি পিছোতে পিছোতে সেই ড্রেনেই গিয়ে পড়ল। বল তুলে আনার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এই রে! আমার মাদুলি!

আমি অবাক। সবাই মিলে খুঁজে খুঁজে মাদুলি উদ্ধার হল। দেখা গেল তাগাটা ছেঁড়া।

তবু সন্দেহটা ছিল। পরের ঘটনাটা চমকপ্রদ। আমাদের আর এক বন্ধুর ভাই হয়েছে। সেটা ততটা জানা ছিল না। এক দিন কী করতে তাদের বাড়িতে গেছি। বন্ধু তার সদ্যোজাত ভাইকে দেখাবে বলে সেই ঘরে নিয়ে গেল। আর ঘরে ঢুকতেই পটাং করে একটা শব্দ হল। আমার মাদুলিটা ছিটকে গিয়ে একটা পেতলের কলসির গায়ে লেগেছে!

সৎ, গরিব, ব্রাহ্মণ : হাঁড়িতে মা ভবানী

সৎ, গরিব এবং ব্রাহ্মণ— এই তিনটে কথা পরস্পরের অতি নিকট আত্মীয়। বামুনদের কোনও কালেই তেমন পয়সা ছিল না। তার ওপর সৎ হলে তো আরও চমৎকার। তার হাঁড়িতে মা ভবানীর আসন একেবারে পাকা। তার ওপর লোকটা যদি পূজারি বামুন হয় তো সোনায় সোহাগা।

সতীশ ভরদ্বাজকে নিয়ে আমি বিস্তর লিখেছি। গল্পে, কাহিনিতে তাঁর কথা প্রায়ই আমার কলমের ডগায় এসে পড়ে। তখন আমরা লামডিঙে। অসম রাজ্যের এক অপরূপ শহর। এক দিকে উঁচু টিলা আর জঙ্গল, ঝরনাও আছে। অন্য ধারে উচ্চাবচ ঢেউ খেলানো পরিসরে একমুঠো শহর। রেলের বড় অফিস ছিল সেখানে। আমরা সেখানে তিন দফায় থেকেছি। দু'দফায় টিলার ওপর নির্জন রেল বাংলোয়, তৃতীয় বা শেষ দফায় সমতলে আর একটি বড় রেল কোয়ার্টারে। এই বাসস্থানটি লোকালয়ের মধ্যবর্তী হওয়ায় আমাদের সকলেরই ভারী পছন্দ। বাজার-টাজার সবই কাছাকাছি, পাশেই খেলার মাঠ। আমাদের এই বাড়িতেই সতীশ ভরদ্বাজকে আমি প্রথম দেখি। টকটকে ফরসা রং, অতি সুপুরুষ, সত্তরোর্দ্ধ্ব বয়সেও মজবুত দাঁতের সারি। ভারী প্রশান্ত তাঁর মুখ, হাসিটি ভারী সরল। ভারী ধীরে কথা বলেন। চমৎকার রসবোধ। ইনিই তিনি, যিনি সৎ, বামুন এবং ফলত গরিব। তদুপরি, পেশায় এক জন পুরোহিত, যাঁকে আমরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পুরুত বলে থাকি। তিনি উদ্বাস্তু। দেশছাড়া হয়ে কোন লতায়-পাতায় আত্মীয়তার সূত্র ধরে লামডিঙে এসে পড়েছেন। দেশেও যে খুব ভাল অবস্থায় ছিলেন, তা নয়। এ দেশে এসে বিপদ আরও বেড়েছে। তবে, মাথা ঠান্ডা এবং ঈশ্বরবিশ্বাস অতিশয় জোরালো হওয়ায় মানুষটিকে কখনও হাহাকার করতে শুনিনি। তিনি বিপত্নীক। দুই ছেলেকে নিয়েই তাঁর সংসার। এক জনের নাম সত্য, অন্য জনের নাম জ্ঞান। দুটির মধ্যে সত্য আবার পাগলাটে-খ্যাপা গোছের। তার লেখাপড়া বেশি এগোয়নি। জ্ঞান তখনও পড়াশোনা করছে।

ভারতবাসী এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের সংসার কী ভাবে চলছে বা তাঁরা কী ভাবে বেঁচে আছেন, তা অতীব রহস্যময়। সতীশ ভরদ্বাজকেও আমার এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হত। তাঁর বড় ছেলে সত্য মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসত। 'কী দিয়ে ভাত খেয়েছিস রে' জিজ্ঞেস করলে সে প্রতি দিন একই জবাব দিত, 'ধুন্দুল বঠি'। অর্থাৎ, ধুঁধুলের তরকারি আর ভাত, এর বেশি কিছুই কোনও দিন জোটাতে পারতেন না তাঁরা। কিন্তু কখনও সতীশবাবুকে তা নিয়ে আক্ষেপ করতে শুনিনি। তিনি রোজই প্রশান্ত এবং প্রসন্ন বদনে কোনও বাড়ি বা মন্দিরে পুজো সেরে দুপুরের দিকে আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ পড়তে আসতেন। হাতে

প্রসাদের পুঁটুলি থাকত। আমাদের ফল বা সন্দেশের টুকরো প্রসাদ দিতেন। মা তাঁকে যত্ন করে চা-বিস্কুট খাওয়াত।

তাঁর খবরের কাগজ পড়াটা ছিল ভারী মজার। বেশ গলা ছেড়ে পড়তেন, এবং দুলে দুলে, ফলে আমাদেরও খবর শোনা হয়ে যেত। টাইফয়েডের সময় শয্যাগত অবস্থায় ওই খবর শোনাটা ছিল আমার এন্টারটেনমেন্ট।

আমাদের বাড়িতেও লক্ষ্মীপুজো বা সরস্বতী পুজো সতীশবাবুই করতেন। কিন্তু দক্ষিণা, প্রণামী, ভোজ্যবস্তু নিয়ে কখনও একটি কথাও বলেননি। মাগুনে বামুন নন বলেই বোধহয় অনেকে একটু বেশি করেই দিত তাঁকে। কিন্তু সে আর কতই বা বেশি! মাঝে মাঝে গল্প করতেন, 'বুঝলি রে! দ্যাশে থাকতে খুব খাইতে পারতাম। মাষকলাই ডাইল দিয়া এক পাতিল ভাত তল কইরা ফালাইছি। ... আমার এক বিধবা পিসি আছিল বুঝলি, গ্রামসম্পর্কের পিসি। আমার খাওন দেইখ্যা এক দিন কইল, খাবি রে বাবা? তয় বেহানবেলা আহিছ, তরে সর খাওয়ামু। বুঝলি, গামলার মতো বড় একখান জামবাটি-ভরা সর মিছরির দানা দিয়া সেই যে খাইছিলাম, আইজও স্বাদখান মুখে লাইগ্যা রইছে।'

সোনালি দিন সোনার হরিণের মতোই উধাও। ১৯৪৯-এর লামডিঙে সতীশ ভরদ্বাজের বর্মার মোটা সস্তা চালের ভাত আর ধুঁধুলবঠি ছাড়া বিশেষ কিছু জুটত না, ক্বচিৎ কদাচিৎ ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ ছাড়া। কিন্তু সত্তরোর্ধ্ব সতীশবাবুর পেটে তখন চড়া পড়ে গেছে।

লামডিঙের ঠাকুরমশাই হিসেবে তাঁকে প্রায় সবাই চিনত। রেলের বড় অফিসার থেকে মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী, উকিল বা ডাক্তার বা দারোগা, সকলের বাড়িতেই অবারিত যাতায়াত ছিল তাঁর। ইচ্ছে করলে নিজের জন্য একটু-আধটু সুবিধে কি আদায় করতে পারতেন না তিনি? কিন্তু সে রকম কোনও উদ্যোগই তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর ইষ্টদেবতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। কথায় কথায় বলতেন, লক্ষ্মীনারায়ণ যা করবেন। বাপের এই নিস্পৃহতা সত্যর বিশেষ পছন্দ ছিল না। রাগ করে সে ঘোর ঠাকুর-বিরোধী হয়ে উঠেছিল। উন্মার্গগামী ছেলেকে দিয়ে ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করানোর জন্য সকালে উঠে সত্যকে ডেকে বলতেন, বাবা রে, এক বার একটু লক্ষ্মীনারায়ণের নাম ল'। সত্য চিড়বিড়িয়ে উঠে বলত, নিমু না তোমার লক্ষ্মীনারায়ণের নাম। সতীশবাবু সেই গল্প আমাদের শুনিয়ে বলতেন, আমার পোলাটা বলদ তো, তাই নিমু না কইয়াও নামটা তো মুখে লয়!

ইস্তিরি করা জামাকাপড় তাঁকে কখনও পরতে দেখিনি। নিজের এবং ছেলেদের জামাকাপড় নিজেই কেচে নিতেন। দুবেলা নিজেই রান্না করে ছেলেদের খাওয়াতেন, যে দিন জুটত। মাঝে মাঝে তাদের যে উপবাসেও থাকতে হত, তাও লোকমুখে শুনতে পেতাম। যে দিন খাওয়া জুটত না, তার পর দিনও তাঁর মুখে প্রসন্নতা

ও প্রশান্তির অভাব ঘটত না। এক বার খিদের জ্বালায় সত্য তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল রাগ করে। উলটে তাকে কিছুই বলেননি সতীশবাবু। হাসপাতালে গিয়ে মাথায় একটু আয়োডিন আর তুলোর পট্টি লাগিয়ে এসেছিলেন মাত্র।

মিষ্টি বলতে মুড়ি + চিনি

আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত এলেই তাঁকে বা তাঁদের প্লেটভর্তি মিষ্টি দেওয়া হয়। আর তার জন্য আমরা, ছোটরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকতাম। বাড়িতে কেউ এলেই আমাদেরই পয়সা নিয়ে নিকটবর্তী মিষ্টির দোকানে ছুটতে হত। নিয়মের বড় একটা ব্যত্যয় হত না। আর তখনকার অতিথিরাও ছিলেন ভারী লক্ষ্মী। অম্লানবদনে প্লেট সাফ করে দিতেন। এখনকার অতিথিরা তো খাবার দেখলেই আঁতকে ওঠেন। কারও সুগার, কারও হাই ট্রাইগ্লিসারাইড, কারও হাইপার অ্যাসিডিটি। ময়মনসিংহ ছেড়ে যখন আমরা রেলের নির্বাসনে চলে গেলাম, তখনও ট্র্যাডিশন বড় একটা বদলায়নি। বাড়িতে অতিথি এলে খেতে দিতে হবেই। তবে কাটিহারে তেমন ভাল মিষ্টির দোকান ছিল না। আর আমরা যেখানে থাকতাম, সেই সাহেবপাড়া থেকে দোকানপাট অনেক দূর। মা'কে তাই চিঁড়েভাজা, ওমলেট, নাড়ু-তক্তি, হালুয়া বা পায়েসের ব্যবস্থা করতে হত। শুধু চা-বিস্কুট দিয়ে বিদায় করলে নিন্দে রটত।

ব্যতিক্রম ছিল টকু-বুধোদের বাড়ি। সাহেবপাড়ারই এক প্রান্তে তাদের বাংলো। টকু-বুধোর বাবার চাকরিটাও বেশ ভালই।

কাটিহারে আমার জেঠিমা এসে কিছু দিন ছিলেন। আমি জেঠিমাকে 'বমা' বলে ডাকতাম। বড়মা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আর কী! তা, বমা নতুন জায়গায় এসে প্রায়ই পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়তেন। আমি তাঁর সফর-সঙ্গী। আমাকে না নিয়ে কোথাও যেতেন না। তা, যে বাড়িতেই যাই, সেই বাড়িতেই সবাই খুব সমাদর করেন। আদর করে বসান, খাতির করেন, প্লেটভরা মিষ্টি বা নানা মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দেন। বমা বিশেষ খেতেন না। কিন্তু আমি রাম-পেটুক। চোখের পলকে প্লেট সাফ করে ফেলি এবং বমা খুব গোপনে নিজের প্লেট থেকেও আমাকে খাবার তুলে দেন।

এক বার বমার সঙ্গে টকু-বুধোদের বাড়ি বেড়াতে গেছি। তাঁরাও মুখে যথেষ্ট সমাদর করলেন। গল্পগাছাও বিস্তর হতে লাগল। কিন্তু খাবারের প্লেট আর আসে না। হা-পিত্যেশ করে বসে থেকে থেকে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। আমি বমার শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি শুরু করলাম। বমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অবশেষে বাধ্য হয়ে বলে ফেললেন, 'আগো, আমাগো পোলার তো বড় ক্ষুধা পাইছে। তোমরা পোলাটারে খাওনের কিছু দেও।'

এই শুনে টকু-বুধোর মা বেজার মুখে উঠে গিয়ে একটা বাটিতে খানিকটা তেলমাখা মুড়ি নিয়ে এসে আমার হাতে বাটিটা দিলেন। সাত-আট বছর বয়সি একটা ছেলের কাছে তেলমাখা মুড়ির চেয়ে অখাদ্য আর কী-ই বা হতে পারে। সুতরাং, ফের বমার আঁচল ধরে টান। বমা বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা আঁচ করে বললেন, 'আগো, তোমাগো ঘরে মিষ্টি কিছু নাই?' তখন টকু-বুধোর মা সেই মুড়িটাই খানিকটা চিনি মিশিয়ে ফের এনে দিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে বমা'র কী রাগ! এমন পিচাইশা বাড়ি আর দেখি নাই। বাচ্চাটারে একটা মিষ্টিও দিতে পারল না!

তখনই জানা গেল, টকু-বুধোদের বাবা খুব কৃপণ লোক। তাঁর শাসনে বাড়িতে সব রকম বাজে খরচ বন্ধ। ভিখিরিরাও ও-বাড়ি এড়িয়ে চলে।

টকু আর বুধো দুই ভাই আমারই প্রায় সমবয়সি। সুতরাং আমাদের বন্ধুত্ব হতে বেশি দেরি হল না। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন এবং বাঁদরামির সূত্রেই আমাদের সাহেবপাড়ার ছেলেদের গলায় গলায় ভাব। এক-এক দিন এক-এক জনের বাড়িতে খেলা হত। সেই সূত্রেই ওদের বাড়িতেও যেতে হত আমাকে।

এক দিন জল খেতে টকু আর বুধোর বাড়ির ভেতরে ঢুকেছি। দেখি, টকু-বুধোর বাবা গম্ভীর মুখে বাইরের ঘরে বসে আছেন। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। মাথায় খোঁচা খোঁচা খাড়া চুল! তখন বাবাদের আমরা খুব ভয় পেতাম। সে নিজের বাবাই হোক, বা পরের বাবা। টকু-বুধোর বাবা আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, এই যে বাবা রুণু, তোমাদের বাড়িতে মাসে ক'সের সরষের তেল লাগে বলো তো?

মাসে ক'সের সরষের তেল লাগে, তা আমার জানার কথাই নয়। কিন্তু ভাবলাম, কী জানি, জানি না বললে যদি ভদ্রলোক রেগে যান! তা ছাড়া বরাবরই আমি একটু বোকাসোকা গোছের। কোথায় কী বলতে হয়, তা ঠিক করে উঠতে পারি না। আমি আকাশপাতাল ভেবে সম্পূর্ণ আন্দাজে বলে দিলাম, দশ সের।

কাউকে ও রকম আঁতকে উঠতে আমি কদাচিৎ দেখেছি। উনি হাঁ হয়ে আমার দিকে খানিক ক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করতে লাগলেন, দশ সের! দশ সের! না, না, না, না। এ তো খুব অন্যায় কথা! এ তো একদম ঠিক নয়!

আমিও একটু থতমত খেয়ে গেছি। বেশি বলে ফেললাম, না কি কম হয়ে গেল, তা বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ উনি বোমার মতো ফেটে পড়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, তোমার মা কি তেল দিয়ে আঁচান?

সেই রাগ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসি। বাড়ি ফিরে মা'কে ঘটনাটা বলতেই মা বলল, সে কী! এইটুকু ছেলের কাছ থেকে কেউ তেলের হিসেব চায়? আর তুই-ই বা অত হাঁদা কেন? বলতে পারলি না যে তুই ওসব জানিস না!

বমা শুনে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, আরে ওইটা তো একটা পিচাশ। খাড়াও, আমি গিয়া কইয়া আমু, মশয়, শুধু আচাই না, আমরা ত্যাল ঢাইল্যা ছানও করি। তাতে আপনের কী! আইজই আমি গিয়া হারামজাদারে দুই কথা শুনাইয়া আমু। পোলাপানের কাছে তার বাড়ির খবর জানতে চান, কেমন ভদ্রলোক মশয়? যে দিন পোলাটারে ত্যাল মুড়ি খাইতে দিছিল, হেইদিনই বুঝছিলাম অরা প্যাতনা পিচাশ।

শেষ পর্যন্ত বমাকে টকু-বুধোদের বাড়িতে হানা দিতে দেওয়া হয়নি। তাতে দু'বাড়ির সম্পর্ক বিগড়ে যেত। বাবা অতি সৎ মানুষ। জীবনে ঘুষ খাননি। কাজেই আমাদের একটু টানাটানিরই সংসার। ঘটনাটা শুনে বাবা বললেন, ঠিকই তো কইছে। রুণুর মায়ের ত্যাল খরচের বহর তো কম না।

সমাপ্ত